আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

শশধর সিংহ



আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

নব ভারত স্রষ্টা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

শশধর সিংহ

প্রকাশন বিভাগ
তথ্য ও বেতার মন্ত্রক
ভারত সরকার

ডিসেম্বর, ১৯৭৫ (December, 1975)
অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৮৯৭ (Agrahayana-Pausa, 1897)

ASUTOSH MOOKERJEE (*Bengali*)

বাংলা অনুবাদ ক্ষিতীশ রায়

মূল্য : ৩·৫০

Price : 3·50

ডিরেক্টর, প্রকাশন বিভাগ, তথ্য ও বেতার মন্ত্রক, পাতিয়ালা হাউস, নূতন দিল্লী-১১০০০১ কর্তৃক প্রকাশিত এবং জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাঃ লিমিটেড, ১১৯ লেনিন সরণী, কলিকাতা ৭০০ ০১৩ হইতে মুদ্রিত

কলিকাতায় প্রাপ্তিস্থান : ৮ এস্প্ল্যানেড ইস্ট (একতলা)
কলিকাতা

ভূমিকা

ভারত সরকারের প্রকাশন সংস্থা আমাকে চিঠি লিখে জানতে চাইলেন তাঁদের প্রকাশিত নবভারত স্রষ্টা (Builders of Modern India) গ্রন্থমালায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনী লিখতে আমি প্রস্তুত কি না। ব্যাধিতে পঙ্গু থাকা সত্ত্বেও আমি সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের প্রস্তাবে সম্মতি জানালাম, দুটি কারণে। প্রথমত, ভারতের আধুনিক কালে নিষ্ক্রমণ সংক্রান্ত সকল বিষয়েই আমার আগ্রহ সমধিক। দ্বিতীয় যে কারণটি আমার কাছে আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে হল তা এই যে, বর্তমান শতকে ভারতের শিক্ষার ক্ষেত্রে যিনি কর্মশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, দেশ গঠনে যাঁর অসামান্য দানের জন্য দেশবাসী চিরকাল ঋণী থাকবে, সেই আশুতোষের জীবনী লেখার সুযোগ পাওয়া আমার পক্ষে পরম গৌরব ও আনন্দের বিষয়। এ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য মনে হল।

ভারতে উচ্চশিক্ষার ধারা যে-রূপ নিয়েছে তা আশুতোষেরই সৃষ্টি। আর পাঁচজন লোক যে-সব দূরতিক্রমনীয় বাধার সম্মুখীন হলে অভিভূত বোধ করতেন, সেই সব বাধা সবলে ঠেলে দিয়েও তাঁকে এই কাজ করতে হয়েছে। যেমন ছিল তাঁর চিত্তের প্রসার তেমনি ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব। তাঁর সাহসের তুলনা ছিল না, কর্মশক্তি যেমন অসাধারণ ছিল তেমনি ছিল তাঁর নিয়ন্ত্রণদক্ষতা। তাঁর মধ্যে এইসব গুণের একত্র সমাবেশ ঘটেছিল বলেই তিনি এক প্রকার একা হাতে এ দেশে উচ্চশিক্ষা এবং বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সৌধ গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। প্রায় চল্লিশ বছর হল তিনি ইহজগত ছেড়ে চলে গেছেন, কিন্তু উচ্চশিক্ষার নামে এ পর্যন্ত ভারতে যা-কিছু ঘটেছে, স্বচ্ছন্দে বলা চলে যে সে-সমস্তই তাঁর চিন্তা বা কৃতির অনুবৃত্তি। বহুকাল আগে বুনিয়াদ তিনি পত্তন করে গেছেন।

(দুই)

তিনি যা করতে চেয়েছিলেন সংক্ষেপে তাকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। সর্বপ্রথমে তিনি চেয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার দরজা প্রশস্ততর করে বহু লোকের জন্য তা উন্মুক্ত করতে। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল সংকীর্ণতা থেকে দেশকে মুক্ত করতে হলে, সমাজে প্রগতি আনতে হলে, উচ্চশিক্ষার ছিটেফোঁটা সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। দ্বিতীয়ত, তাঁর লক্ষ্য ছিল অপেক্ষাকৃত উঁচু স্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নীত করে পাশ্চাত্ত্য মানের তুলনীয় করে গড়ে তুলতে। তৃতীয়ত, তাঁর অন্তরের গভীর বাসনা ছিল যে-কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন সেই তাঁর অতি প্রিয় শিক্ষায়তন যেন কেবল পরীক্ষা নেবার প্রতিষ্ঠানরূপে না থেকে পঠন পাঠন ও গবেষণারও কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠে। আমার বিশ্বাস এ-স্বপ্ন তাঁর জীবৎকালেই সফল হয়েছিল। চতুর্থ দফায় তিনি যে কাজটি করতে চেয়েছিলেন সেটাই ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ ও দুরূহতম কাজ। সরকার ও আমলাতন্ত্রের কর্তৃত্ব ও অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থা ও প্রশাসন ব্যবস্থাকে তিনি মুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার মান ও আদর্শ কী প্রকার ছিল এবং তাঁর পরিকল্পিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মান ও আদর্শ কেমন হওয়া উচিত ও কী ভাবে তা তিনি বাস্তবে রূপায়িত করার কাজে হাত দিয়েছিলেন, সেইটুকু অনুধাবন করে দেখলেই বুঝতে পারা যায় কী বিরাট কর্তব্যের ঝুঁকি তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

প্রশাসনের দিনগত সমস্যা নিরসনের নিতান্ত সংকীর্ণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইংরেজ এ-দেশে উচ্চশিক্ষার প্রবর্তন করেছিল। সাম্রাজ্য চালাতে গেলে প্রশাসনের পরিধি নিত্য বর্ধমান হতে বাধ্য। এই বিরাট প্রশাসনিক কাঠামো তুলে ধরার জন্য অল্প খরচে খুঁটি ও ঠেকো দেবার প্রয়োজনে, ইংরেজ ভারতীয়দের মধ্যে থেকে এমন কিছু লোক বেছে নিতে চেয়েছিল রবীন্দ্রনাথ অবজ্ঞাভরে যাদের বলতেন 'যোগ্য পাত্র'। ভারতে উচ্চশিক্ষা

প্রবর্তনের পিছনে এটাই ছিল মুখ্য কারণ। ইংরেজ পরিষ্কার বুঝেছিল নিজেদের দেশ থেকে লোক আমদানী করে কেবল ইংরেজকে দিয়ে প্রশাসন চালানো অসম্ভব ব্যয়সাপেক্ষ হবে। তাছাড়া রাজার জাতের লোক এদেশে এসে কেরাণীর কলম পিষতে গেলে মানসম্ভ্রম বাঁচিয়ে চলা শক্ত।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা এদেশে শিকড় গেড়ে বসতে না বসতেই ইংরেজ আঁচ করতে পেরেছিল এযেন ছুঁচ হয়ে ঢুকল, ফাল হয়ে বেরোবে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের বুঝিয়েছিল যে প্রথম নজরে বিপজ্জনক মনে হলেও, এমন কিছু ক্ষতি হয়তো হবে না, কারণ নকলনবিশী ভারতীয়দের এমন মজ্জাগত যে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতীয়েরা ইংরেজদের তল্পিবাহক হয়েই থাকবে। কিন্তু যেসব ইংরেজ ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁদের বাস্তবদৃষ্টিতে বিপদের সম্ভাবনা গোড়াতেই রহিত করার কথা মনে হল। তাঁরা সূচনাতেই স্থির সিদ্ধান্ত হলেন যে এ-দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে পুরোপুরি শাসকের কব্জায় রাখতে হবে, তা না হলে একদিন হয়তো উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিতটুকু ধরে নাড়া দিতে পারে।

১৮৫৪ সালে স্যর চার্লস উড্-এর ডেসপ্যাচ্ থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় আমলাতন্ত্রী ইংরেজের অভিসন্ধি কি ছিল। এই ডেসপ্যাচ্-এ তিনি বলেছিলেন যে তাঁর মতে ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠির তাঁবেদার উচ্চ বর্গের অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সুবিধা সীমাবদ্ধ করে রাখাটাই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত হবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য উচ্চশিক্ষার দরজা উন্মুক্ত করে দেবার তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন, কারণ তাঁর ধারণা হয়েছিল মধ্যবিত্তেরা সে সুযোগ পেলে একদিন না একদিন শাসকের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকট করবে। তিনি বলেছিলেন, "যারা ভবিষ্যতে আমাদের নিন্দা করবে, বিরুদ্ধতা করবে, আমাদের চারিদিকে অসন্তোষের গুঞ্জন তুলবে, তাদের হাতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ তুলে দিতে আমার কোনো

সায় নেই।" কিন্তু কর্তাব্যক্তিরা সরকারের শাসন-ব্যবস্থা চালু রাখার খাতিরে উড্-এর এই আপত্তি গ্রাহ্য করেননি।

ভারতীয় তথা ইংরেজদের অন্যান্য ঔপনিবেশিক প্রজাপুঞ্জের মধ্যে কেবল যে উচ্চশিক্ষার প্রভাবে স্বাজাত্যাভিমানের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল—এমন ধারণা কতখানি সত্য সেটাও বিতর্কের বিষয়। শিক্ষার ফলে নবচেতনার উন্মেষ ঘটেছিল সত্য—কিন্তু প্রভুশক্তি কৃপণ হাতে যতটুকু শিক্ষা পরিবেশন করার ব্যবস্থা করেছিলেন তার ফলেই দেশময় বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল—এমন বলাটা অসঙ্গত।

অপরপক্ষে ফরাসীদের উপনিবেশ শাসন-পদ্ধতি অনুধাবন করে দেখলে দেখা যায় ইংরেজদের পদ্ধতি থেকে তা সম্পূর্ণ আলাদা। তাদের বিভিন্ন উপনিবেশে প্রশাসনের দায়িত্বটুকু তারা সচরাচর নিজেদের কব্জার মধ্যেই রেখেছে। উপনিবেশে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে যতটুকু না হলে নয়। তৎসত্ত্বেও কিন্তু ফরাসী-উপনিবেশে প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ ভারতের চেয়ে কম দেখা যায়নি। এ-সব উপনিবেশের স্বদেশী আন্দোলনে যারা নেতৃস্থানীয় তাঁরা হয় বাড়িতে বসে নিজে নিজেই পড়াশুনা করেছেন অথবা উচ্চশিক্ষা পেয়েছেন প্যারিসে কিংবা ফ্রান্স-এর অপর কোনো বড় শহরে। তাহলেই দেখা যায় দেশাত্মবোধের ব্যাপারটা শিক্ষার উপর নির্ভরশীল নয়, পরপদানত সকল জাতির সুপ্তচেতনার মধ্যে এই বোধ নিহিত থাকে।

১৮২৮ সালে এক ইংরেজ বন্ধুকে রামমোহন রায় লিখেছিলেন: "ধরে নেওয়া যাক আজ থেকে একশো বছর পরে, পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে নিয়ত যোগাযোগের সূত্রে এতদ্দেশীয় লোকেদের সাধারণ জ্ঞান কিংবা রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞান বৃদ্ধি পেল, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানও তাদের আয়ত্তিভূত হল। এমন অবস্থায় পৌঁছলে পর যে সমস্ত অন্যায় কিংবা অত্যাচার বিশ্বসমাজের চোখে তাদের হেয় করে রেখেছে, সেই সমস্ত অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার জন্য তারা কি স্বেচ্ছায় ও সাহসে ভর দিয়ে এগিয়ে আসবে না?"

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মনেও এই ভাবনা ছিল—তিনিও বিশ্বাস করতেন শিক্ষা মানুষের মনকে মুক্তি দেয়। তবে রামমোহনের সঙ্গে তাঁর একটা মস্ত তফাত এই ছিল যে, তিনি কেবল বিশ্বাস করে ক্ষান্ত ছিলেন এমন নয়, শিক্ষা ছিল তাঁর জপতপধ্যানের মতো। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সত্যকার আধুনিক বিদ্যায়তনে পরিণত করে তাকে সর্বজনের সামগ্রী করে তোলার জন্য তিনি আজীবন যে সাধনা করে গেছেন, তা থেকেই একথা প্রমাণ হয়।

কল্যাণী, পশ্চিমবঙ্গ　　　　　　　　　　শশধর সিংহ
১৯৬৯

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার শরীরের এই পঙ্গু অবস্থায় নানা ব্যাপারে পরনির্ভর না হয়ে আমার গত্যন্তর নেই। যাঁরা এই জীবনী রচনার কাজে আমাকে নানাভাবে সহায়তা ও আনুকূল্য করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরির ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এই কাজের জন্য অপরিহার্য একটি বই সংগ্রহ করার প্রস্তাব তিনিই আমাকে দিয়েছিলেন—বইটির নাম Asutosh Mookerjee—A Biographical Study লিখেছেন ডক্টর এন. কে. সিংহ। এ ছাড়া আরো কিছু বই ও মূল্যবান তথ্যাদি তাঁর কাছেই আমি পেয়েছি। কলকাতা মৌলানা আজাদ কলেজের অধ্যাপক শ্যামল সেনগুপ্ত আমার এই কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একাধিক গ্রন্থ আমার হয়ে লাইব্রেরি থেকে ধার নিয়েছিলেন। কল্যাণী বি. টি. কলেজের অধ্যাপক গৌরমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সমসাময়িক পরিবেশের ঐতিহাসিক উপাদান আমার জন্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন। এই তিনজনের কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। তারপরেই ধন্যবাদ দিতে হয় আমার স্ত্রীকে—আমার পাণ্ডুলিপি তিনি পড়ে দেখে দিয়েছেন, আমার হাতের লেখায় দু-তিনটি পরিচ্ছেদ দেখে ঠিক করে দেবার পর, আমার লেখা অন্যান্য বইয়ের মতো এ বইও আগাগোড়া মিসেস জলিকে দিয়ে যথা প্রয়োজন টাইপ করিয়ে দিয়েছেন। এই দু'জনের কাছে আমি গভীরভাবে ঋণী।

শ. সি.

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

অবতারণা

যদিচ কলকাতার কাছেই ব্যারাকপুরে সিপাহী বিদ্রোহের সূত্রপাত, ১৮৫৭ সালের এই বিরাট আন্দোলনের ঢেউ কিন্তু বাংলাকে খুব বেশি প্রভাবিত করে নি। উত্তর ভারতে এর ঢেউ গিয়ে লেগেছিল প্রচণ্ডভাবে এবং সেখানেই এই আন্দোলনের নিরসন ঘটেছিল। তত্রাচ মনে রাখা উচিত ১৮৫৭ সালেই এই প্রদেশ মোড় নিয়েছিল বিবর্তনের নূতন রাস্তায়। উনিশ শতকের সূচনায় রামমোহন রায় বাংলায় যে নবজাগরণের সূত্রপাত করেছিলেন, পঞ্চাশ বছর কালের মধ্যে তার যে পরিণতি ঘটেছিল তার ফলে বাঙালী জাতির জীবন প্রভাবিত হয়েছিল গভীরভাবে। গোড়ায় সংস্কার ভাঙবার যে আতিশয্য দেখা দিয়েছিল, সেই ছেলেমানুষি ভাব কেটে গিয়ে দেখা গিয়েছিল পরিণত বয়সের দায়িত্ববোধ। এই নূতন যুগের যুগপুরুষ হয়ে এসেছিলেন বাংলার কতিপয় বিশিষ্ট সন্তান।

তাঁদের সকলের নাম না করলেও সর্বজন পরিচিত কয়েকটি নামের উল্লেখ অবশ্যই করা উচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় একদিকে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দের নাম—এবং সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকারের নামও। অন্যদিকে রাজনীতিকদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

সম্ভবত এমন কথাও বলা যায় যে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলার বিদ্বৎসমাজ ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা দেশের সমস্যাগুলি যেন

নূতন চোখে দেখতে শুরু করলেন ও সমাধানের নূতন পথ সন্ধান করতে লাগলেন। এই সময়ে ভারতে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে রাজনীতির ক্ষেত্রে বাংলা যে গৌরবের অধিকারী হয়েছিল, তার মূলে যে ছিল এই সংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি, সেকথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। The Rise and Fulfilment of British rule in India গ্রন্থে টমসন ও গ্যারেট বলেছেন: "অধিকাংশ ভারতীয় তখন ধরে নিয়েছিলেন এদেশে ব্রিটিশ শাসন কায়েম হয়েই থাকবে। পুরুষানুক্রমে যদি বিদেশী শাসনের অধীনে থাকতেই হয়, তাহলে সে শাসনকে দেশের মঙ্গলে চালনা করাটাই সমীচীন হবে—এমন অনেকে চিন্তা করতে লাগলেন। এই মনোভাব দেখা গিয়েছিল বাংলাতেই বেশি। তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, চিন্তা-ভাবনা, ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে দীর্ঘকালের যোগাযোগ এবং রাজধানী কলকাতার সান্নিধ্য—এইসব কিছু মিলে রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের নেতৃত্ব একপ্রকার অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল।"

কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা বলতে হবে যে ঠিক সেই সময়েই ইংরেজদের মধ্যে জাতিবৈষম্য ও বর্ণবিদ্বেষ প্রবল হয়ে উঠতে থাকে ও দেশের লোকের মনে এর গভীর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরবর্তী ইংরেজদের হাবেভাবে বিজয়ীর দম্ভ উৎকট হয়ে দেখা দিতে থাকে। ইতিপূর্বে সামাজিক স্তরে ইংরেজ ও ভারতবাসী পরস্পরের সঙ্গে সমভাবে মিলতে-মিশতে পারত। তা সম্ভবপর হয়েছিল বলেই হয়তো বাংলার নবজাগরণও সম্ভবপর হয়েছিল। যদিচ দেশের লোকই এই আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল, সরকারী কিংবা বে-সরকারী ভাবে ইংরেজ যদি তাদের পিছনে এসে না দাঁড়াত, তাহলে হয়তো এতখানি এগিয়ে যাওয়া শক্ত হত।

এই সহযোগের অন্তর্নিহিত কারণ ছিল ইংরেজ কর্তৃপক্ষ শ্রেণীর আভিজাত্য।

সে যুগের আমলাতন্ত্রীদের মধ্যে যেসব ইংরেজ দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত

থাকতেন, তাদের বেশির ভাগ ছিলেন অভিজাত সমাজের লোক। শাসন কর্মে কিংবা সামাজিক আদান-প্রদানে তাঁদের আচরণের মধ্যে উঁচু ঘরানার পরিচয় থাকত। সমাজ সংস্কারের ব্যাপারে ভারতীয়দের পাশে এসে দাঁড়াবার মতো দায়িত্ববোধ যেমন তাঁদের ছিল, তেমনি তাঁরা ভারতের ঐতিহ্য বিষয়েও গভীরভাবে অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। ইঙ্গ-ভারতীয় যোগা-যোগের প্রথম পর্বে ইংরেজদের মধ্যে থেকে অনেক সুযোগ্য শাসক ও মনীষীর উদয় হয়েছিল। উত্তরসিপাহী-বিদ্রোহ-যুগে তাঁদের সংখ্যা ছিল নগণ্য।

১৮৫৭ সালের আন্দোলনের ফলে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্‌টে যায়। ততদিনে রেলগাড়ী, বাষ্পীয় জাহাজ ও টেলিগ্রাফ আবিষ্কারের ফলে, ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের সুবিধা বৃদ্ধি পায়। এই সুযোগ-সুবিধার পরোক্ষ ফলস্বরূপ এদেশে ইংরেজের শাসনতন্ত্রের মান ক্রমশঃ অবনতি লাভ করতে থাকে।

১৮৮৩ সালের ইল্‌বার্ট বিল নিয়ে বাদানুবাদের সময় ইংরেজদের বর্ণ-বিদ্বেষ চরমে উঠে।

১৮৫৮ সালে মহারানী ভিক্টোরিয়া নিজের হাতে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করার সময় ঘোষণা করেছিলেন যে, দেশ শাসন ব্যাপারে এবং দায়িত্ব-পূর্ণ কাজে নিযুক্ত করার ব্যাপারে, জাতিবর্ণধর্ম নির্বিশেষে সকল ভারতীয় ইংরেজদের সঙ্গে সমান অধিকার পাবেন এবং কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব করা হবে না। ইল্‌বার্ট বিল নিয়ে আন্দোলনের সময় স্থানীয় ইংরেজদের মধ্যে যে উগ্র প্রচারকার্য চালানো হয়েছিল, তা থেকে একটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝা গিয়েছিল যে পরবর্তী যুগে বর্ণ-বিদ্বেষ-প্রসূত পক্ষপাতমূলক মনোবৃত্তি হবে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

সেই প্রথম পদাধিকার বলে বিশেষ অধিকার বা সুবিধা লাভের জন্য ইংরেজরা ভারতে নিজেদের প্রতিষ্ঠান গঠন করে। এইভাবে তথাকথিত

ইউরোপিয়ান এসোসিয়েশন-এর উদ্ভব। পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে দেখা যায় এই সংগঠন ইংরেজদের পক্ষে অবিমিশ্র মঙ্গলের হেতু হতে পারে নি। ইংরেজদের দেখাদেখি ভারতের জনসাধারণ বুঝতে পারে নিজেদের দাবী মেটাতে হলে তাদেরও সংঘবদ্ধ হওয়া দরকার। ফলে ইউরোপিয়ান এসোসিয়েশন-এর পাল্টা জবাব হিসাবে, প্রায় একই সময়ে অর্থাৎ ১৮৮৫ সালে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়।

এর আগেই, ১৮৭৬ সালে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন-এর জন্ম। এই এসোসিয়েশন থেকে একটি এমন নূতন পরিস্থিতির সূত্রপাত হয় যাকে বলা যায় অভূতপূর্ব—ভারতের মাটিতে এরকমটা আগে কখনো ঘটেনি, ঘটতে পারে বলে কেউ ইতিপূর্বে ভাবতেও পারে নি। মাৎসিনির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রথমে কলকাতা শহরে পরে ভারতের সর্বত্র, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয়তাবোধের আদর্শ দেশময় ছড়িয়ে দেন। এই মহাননেতার জীবনে স্বদেশ সাধনার এই বিরাট অভিযান ছিল একটি গৌরবজনক অধ্যায়। কেবল জাতীয়তার আদর্শ প্রচার করেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না, এই আদর্শকে সর্বভারতীয় ভিত্তির উপর দৃঢ়ভাবে স্থাপন করার উদ্দেশ্যে তিনি কলকাতায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর একটি অধিবেশন আহ্বান করলেন। কলকাতার প্রখ্যাত ব্যারিস্টর উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৮৫ সালের জানুয়ারী মাসে বোম্বাই শহরে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস-এর প্রথম অধিবেশনে যখন সভাপতিত্ব করছেন, ঠিক সেই সময়েই ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর দ্বিতীয় অধিবেশন কলকাতায় বসে। কলকাতায় এই কনফারেন্স-এর কাজে ব্যস্ত থাকায় সুরেন্দ্রনাথ বোম্বাইয়ের সেই প্রথম অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন নি। কিন্তু তার অল্পকাল পরেই কনফারেন্স অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় কংগ্রেস-এর মধ্যে এবং ভারতে জাতীয়তাবাদীদের একমাত্র প্রতিনিধি সংস্থারূপে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস পরিচিত হয়।

ইংরেজ তথা ভারতবাসীদের কাছেও জাতীয় চেতনার এই নব উন্মেষ ছিল বিস্ময়কর ভাবে নূতন। সুরেন্দ্রনাথের উল্লেখ করে স্যর হেনরি কটন তাঁর New India বইয়ে লিখেছেন: "বাংলার প্রভাব সুদূর পাঞ্জাব পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে একথা কেউ ভাবতেও পারে নি। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা কেমন নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার হয়—মূলতানে যেমন ঢাকাতেও তেমনি।"

ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রীরা ঈশান কোণে ঝড়ের পূর্ব লক্ষণ দেখে, আগের থেকেই নিজেদের অস্ত্রে শাণ দিতে লেগেছিলেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আদি পর্বে ইংরেজ আমলারা কংগ্রেস-এর সহায়তা ও আনুকূল্যের উদ্দেশ্যে অনেকটা রাস্তা এগিয়েও এসেছিলেন, ভেবেছিলেন জাতীয়তাবাদীদের বিশ্বাসভাজন হতে পারলে তাঁদের রাষ্ট্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকেও নিরাপদ খাতে চালনা করা শক্ত হবে না। এরকম ভাবাটা যে কতখানি ভুল হয়েছিল, সে তাঁরা অচিরেই বুঝেছিলেন।

ইংরেজদের এই অপচেষ্টা থেকেই ভারতে সাম্প্রদায়িকতার বীজ উপ্ত হয়। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার তিন বছর পরে, ১৮৮৮ সালে ভারত সম্পর্কিত ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ বিখ্যাত ইংরেজ লেখক স্যর জন স্ট্রাচি লিখিছিলেন: "রাজনীতির দিক থেকে আমাদের শক্তি ও ক্ষমতা দৃঢ় করার প্রধান সহায় হল দুটি বিবদমান ধর্ম-বিশ্বাসের সহ-অবস্থান। এটা এতই সহজ সত্য যে এ নিয়ে মতদ্বৈধ থাকতে পারে না।" কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বাদবিসম্বাদ ঘটিয়ে সাম্রাজ্য শাসনের ব্যাপারটা ঘটেছিল আরো অনেক পরে। বঙ্গভঙ্গের সময় তার নগ্ন চেহারাটা ধরা পড়ে।

১৮৯৯ সালে লর্ড কার্জন এলেন ভারতের নবনিযুক্ত ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল হয়ে। আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর দুরভিসন্ধি প্রকট করলেন। তাঁর মনে উদয় হল যে ভারতে এবং বিশেষ করে বাংলা

দেশে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ, কালে ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্ব নিয়ে নাড়া দিতে পারে। তিনি তাই অঙ্কুরেই তার বিনাশ ঘটাবার সংকল্প নিয়ে, ১৯০৫ সালে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করলেন। বাইরে বলা হল বাংলা বিরাট দেশ, তার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত এত দূরে অবস্থিত যে প্রশাসনিক কারণেই দেশ ভাগ করা দরকার। আসল উদ্দেশ্যটুকু প্রায় সকলেই কিন্তু আঁচ করতে পেরেছিল, সুতরাং প্রশাসনিক অজুহাতটুকু কেউই সত্যকার কারণ বলে মেনে নেয় নি। আসলে কার্জন চেয়েছিলেন বাংলার স্বাজাত্যবোধের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিতে এবং তা করতে গিয়ে যে অঙ্গচ্ছেদের বিধান তিনি দিলেন, তার পরিণাম কোনো পক্ষেই সুখকর হয় নি।

কার্জন-এর এই স্বেচ্ছাচার সারা দেশে অসন্তোষ ও বিক্ষোভের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। এরই প্রত্যক্ষ ফল বাংলার স্বদেশী আন্দোলন। বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য সেদিন বাঙালী একযোগে প্রভুশক্তির বিরোধিতা করে প্রমাণ করেছিল যে, জাতীয় ঐক্যবোধ যখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠে, তখন দমন বা নির্যাতন তার অগ্রগতি রোধ করতে পারে না।

বঙ্গভঙ্গের তাৎপর্যের কথা বলতে গিয়ে মহাত্মা গান্ধী তাঁর Hind Swaraj পুস্তকে বলেছেন, "দেশের সত্যকার নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটেছিল বঙ্গভঙ্গের ফলে। এজন্য আমরা লর্ড কার্জন-এর কাছে ঋণী। বঙ্গভঙ্গ রহিত করার সপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বাঙালীরা লর্ড কার্জন-এর সঙ্গে বিতর্কে নেমেছিল, কিন্তু পদাধিকার-মত্ত ভাইসরয় তাদের যুক্তিতে কান দেন নি। তিনি ধরেই নিয়েছিলেন এ দেশী লোকেরা প্রচুর কথা বলে, কিন্তু আসল কাজের বেলা এদের টিকি দেখা যায় না। কার্জন অসংযত ও লাঞ্ছনাকর ভাষা ব্যবহার করেছিলেন এবং শত বিরোধিতা সত্ত্বেও বাংলাকে ভাগ করেছিলেন। বলা যেতে পারে সেদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরও ভাঙ্গন

শুরু হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গের ফলে ব্রিটিশ শক্তি যেমন ধাক্কা খেয়েছিল, তেমনি ধাক্কা কখনো তাকে খেতে হয় নি।"

নৈতিক দিক থেকে বঙ্গভঙ্গ ছিল বাঙালীর প্রথম অগ্নি পরীক্ষা। সেই সূত্রে বাংলায় যে জাতীয় জাগরণের সূত্রপাত ঘটেছিল তার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী, তার কিছুটা বাংলার মঙ্গলসাধন করেছে নিশ্চয়। কিছুটা আবার এমন সব নিমিত্তকারণ ঘটিয়েছে, যার ফলে বাংলার মহিমা আজ অস্তগত। এই সমস্ত কারণের ফলে কেবল বাংলা কেন সমস্ত ভারতেরও অঙ্গচ্ছেদ ঘটেছে, দেশবিভাগ হয়েছে।

বিংশ শতকের প্রথম পর্বে বাংলা দেশের মুখ্য ঘটনা হল বঙ্গভঙ্গ রহিত করা। বাংলার পক্ষে সে এক অসামান্য কৃতিত্ব—সে কথা মানতেই হবে। কিন্তু তারই আবার প্রত্যক্ষ ফল হল কলকাতা থেকে দিল্লীতে রাজধানীর অপসারণ। বাংলার পক্ষে সে এক মারাত্মক আঘাত—যার জের এই প্রদেশ এখনো ঠিক সামলে উঠতে পারে নি।

রাজনীতিক ক্ষেত্রে বাংলার প্রভাব ক্ষুণ্ণ করার জন্য এই নিদারুণ আঘাত হানা সত্ত্বেও, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রে নানা দিকে এমন অনেক দরজা খুলে যায়, যা থেকে প্রমাণ হয় জাতি হিসাবে ভারতের দরবারে বাংলার আসন সমানই উঁচু হয়ে রইল। শিল্প-কলায় ও সাহিত্যে বাংলা তখনো অগ্রণী এবং সংস্কৃতির এই দুই বিভাগে বাংলার দান যে অগ্রগণ্য—তা নিয়ে দেশে দ্বিমত ছিল না। সেই সূত্রে গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ এই দুই শিল্পী ভ্রাতার কৃতিত্ব আজো স্মরণীয় হয়ে আছে। ভারতীয় শিল্পকলার পুনর্জাগরণের সঙ্গে ক্যালকাটা স্কুল অব আর্ট-এর নাম আজো ওতপ্রোত জড়িত। এই ঘরানারই লোক ছিলেন নন্দলাল বসু প্রমুখ অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যমণ্ডলী। সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঙালীর উৎকর্ষ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে, ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ লাভ করেন। শ্রীঅরবিন্দও ছিলেন

সেই যুগেরই মানুষ। তিনি তাঁর The Ideal of Human Unity গ্রন্থে লিখেছিলেন, "খুবই আশ্চর্যের কথা বলতে হবে যে ভারতের এই একটি জাতি প্রথম থেকেই ইংরেজী ভাষার জোয়াল নিজের কাঁধে তুলে নিতে ঘোরতর আপত্তি করেছিল। নিজেদের ভাষার উন্নতি সাধনে যত্নবান হয়ে তারা সেই কাজটুকুই গ্রহণ করেছিল জীবনের মুখ্য ব্রতরূপে। নিজেদের ভাষা ও সাহিত্যের সাধনায় তারা নিযুক্ত করেছিল তাদের মৌলিক চিন্তা-ভাবনা তাদের সমস্ত উত্তম—অন্যান্য কাজ উপেক্ষা করেও। এই বাংলাই দিয়েছে ভারতের সর্বপ্রধান কবিকে—যাঁর যশ এখন জগৎজোড়া।"

শিল্প-সাহিত্য ছাড়া অপর একটি ক্ষেত্রে বাঙালীর প্রতিভা বিকশিত হয়ে উঠেছিল—সে হল বিজ্ঞান। এই প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নাম করতে হয়। মূলত তাঁর নিজস্ব বিজ্ঞান সাধনা ও গবেষণা এবং ফলিত বিজ্ঞানের চর্চার ফলে, তিনি বেশ কয়েকজন মেধাবী তরুণকে রসায়ন শাস্ত্রের দিকে আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। কালে তাঁকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশে রাসায়নিক বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণার একটি কেন্দ্র গড়ে উঠে। সেই সঙ্গেই নাম করতে হয় জগদীশচন্দ্র বসুর। কেম্‌ব্রিজ থেকে পাশ করে যদিচ তিনি পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হয়েই এ দেশে এসেছিলেন, বিজ্ঞানের যে বিভাগে তিনি নাম করলেন, সে-সব কাজ করার দরুণ লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির ফেলো রূপে নির্বাচিত হলেন, সে বিভাগ পরোক্ষভাবে পদার্থ বিদ্যার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হলেও—তা ছিল পৃথক। চেতন ও অচেতনের মধ্যে প্রাণের প্রকাশ—এই ছিল তাঁর সাধকোচিত গবেষণার বিষয়। বসু বিজ্ঞান মন্দির বিজ্ঞানের একটি দুরূহতত্ত্বের ক্ষেত্রে তাঁর সুদূর প্রসারী কীর্তির স্মারক হয়ে আজো দাঁড়িয়ে আছে।

লর্ড রোণাল্‌ডসে (পরে যিনি মার্কুইস অব জেটল্যাণ্ড নামে পরিচিত হয়েছিলেন) তাঁর The Heart of Aryavarta গ্রন্থে জগদীশচন্দ্র বসুর প্রসঙ্গে লিখেছেন: "বস্তুর উপর শক্তির ক্রিয়া লক্ষ্য করতে গিয়ে তিনি

আবিষ্কার করলেন চেতন ও অচেতনের মধ্যেকার সীমারেখা ক্রমশঃ যেন অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তাদের উভয়ের মধ্যে ক্রমশঃ যেন যোগসূত্র স্থাপিত হতে চলেছে। তাঁর মতে জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রগতির পরাকাষ্ঠা হয়, যদিও নিছক তত্ত্ব হিসাবে নয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণের ভিত্তিতে দেখিয়ে দেওয়া যায় যে, সৃষ্টির বহু বৈচিত্র্যের বিহ্বলতার মধ্যেও একটি ঐক্য সূত্রের যোগে চেতন ও অচেতন সকল পদার্থই বিধৃত।"

মোটকথা, ভারতের মাটিতে আধুনিক বিজ্ঞান তার নিজস্ব আসনটুকু লাভ করল সর্ব প্রথম এই বাংলা দেশেই। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কলকাতা থেকেই বিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়ে পড়ল সারা ভারতে।

স্বদেশী আন্দোলনের মদৎ পাওয়া সত্ত্বেও অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে আশানুরূপ প্রগতি ঘটে নি। আমার মতে এর মুখ্য কারণ ছিল বল্গাবিহীন আদর্শবাদের অবাস্তবতা এবং অর্থ নৈতিক ব্যাপারে অভিজ্ঞতার অভাব। অর্থ নৈতিক উন্নতির পথে এই দুটিই যে দূরপনেয় বাধা—সে আমরা অল্পে অল্পে টের পাচ্ছি।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও জন্মেছিলেন এই 'আথাল-পাথাল' যুগে। একদিকে নবজাগ্রত বাংলার মানবিকতাবোধ এবং জ্ঞানবিজ্ঞানে যে প্রবল আস্থা—তার তিনি ছিলেন উত্তরসাধক। অপরদিকে উত্তর সিপাহী বিদ্রোহ যুগের নানা চাঞ্চল্যকর ঘটনার প্রভাব পড়েছিল তাঁর মনে। ব্রিটিশের বর্ণ-বিদ্বেষ ও পক্ষপাতদোষের কদর্য চেহারা তাঁর মনেও নিশ্চয়ত জুগুপ্সার সঞ্চার করে থাকবে। তারই প্রতিষেধক হিসাবে তিনি নিশ্চয় চেয়েছিলেন উচ্চশিক্ষার দরজা তিনি দেশের লোকের সামনে খুলে দেবেন, যাতে জ্ঞানবিজ্ঞানে পাশ্চাত্ত্যের সমকক্ষ হয়ে ভারত আত্মাবমাননা থেকে মুক্ত হতে পারে। এইজন্যই তাঁর দৃঢ়সংকল্প ছিল যে, যে বিদ্যায়তনে তিনি তাঁর মনের ও আত্মার পুষ্টিলাভ করেছেন সেই জননী-সমান কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয় যেন বিশ্বের আর পাঁচটি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এক পংক্তিতে দাঁড়াতে পারে।

আশুতোষ রাজনীতি পরিহার করে চলতেন—কারণ সেদিকে তাঁর প্রবণতা ছিল না, রাজনীতির শিক্ষাও তিনি পান নি। কিন্তু তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর দেশের লোক যদি স্বচ্ছন্দবিহার করতে পারে, তাহলে রাজনীতিকদের চরম লক্ষ্যবস্তু যে স্বরাজ সাধন—তা আপনা থেকেই সাধিত হবে। তাঁর এ বিশ্বাস যে নিতান্তই ভ্রমাত্মক ছিল, আজকের দিনে কেউ তেমন কথা বলবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পিতৃ পরিচয় ও বাল্যকাল

রামমোহন রায় থেকে আরম্ভ করে এ যুগের অনেক প্রখ্যাত বাঙালী হয় কলকাতার নিকটবর্তী হুগলীতে জন্মগ্রহণ করেছেন, অথবা হুগলীর সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে যুক্ত ছিলেন। আশুতোষের পূর্ব পুরুষদের নিবাস ছিল হুগলী জেলার দিকশূল গ্রামে। কিন্তু তাঁর পিতামহ বিশ্বনাথ স্বগ্রাম ছেড়ে জিরাট নামক গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। সম্ভবত জিরাট থেকে আশুতোষের পিতা গঙ্গাপ্রসাদ কলকাতায় চলে আসেন তাঁর শিক্ষা-দীক্ষার উদ্দেশ্যে।

গঙ্গাপ্রসাদ এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন ১৮৫৭ সালে। চার বছর পরে ১৮৬১ সালে তিনি বি. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আদি যুগে যাঁরা গ্র্যাজুয়েট হয়েছিলেন, গঙ্গাপ্রসাদ তাঁদের অন্যতম। অতঃপর ১৮৬৬ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে তিনি এম. বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ডাক্তার হন। পিতা বিশ্বনাথের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না, অনুমান হয় গঙ্গাপ্রসাদ নিজের শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন প্রতি পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করে জলপানি পাবার ফলে। কলকাতার বৌবাজার অঞ্চলে ২৯নং (আগে ছিল ১০/১ নং) মলঙ্গা লেনস্থিত বসতবাটিতে তিনি থাকতেন। সেখানেই পিতা ডাক্তার হয়ে বেরোবার দু'বছর আগে ১৮৬৪ সালের ২৯ জুন তারিখে আশুতোষের জন্ম হয়।

শোনা যায় গঙ্গাপ্রসাদের সাংসারিক অসচ্ছলতা লক্ষ্য করে, মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল স্যর চার্লস তাঁর প্রিয় ছাত্রের জন্য সরকারী চাকুরীর ব্যবস্থা করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। মেডিকেল কলেজের পাঠ শেষ হবার

পর তিনি গঙ্গাপ্রসাদকে ভাইসরয়-এর মিলিটারি সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করতে বলেন—একটি অস্থায়ী চাকুরীতে যোগ দেবার জন্য। মিলিটারি সেক্রেটারি তাঁর গুণাগুণ ও সুপারিশ-পত্রাদি দেখে খুশি হয়ে কাজটা তাঁকে বরাদ্দ করবেন বললেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাবে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন যে সরকারী ডাক্তার হতে হলে গঙ্গাপ্রসাদের পোশাক-পরিচ্ছদ বদলানো বাঞ্ছনীয় হবে।

অন্যান্য বাঙালী ভদ্রলোকের মতো গঙ্গাপ্রসাদ গিয়েছিলেন ধোপদুরস্ত ধুতির উপর গলাবন্ধ কোট চাপিয়ে। সেটা লক্ষ্য করে সাহেব বলেছিলেন সরকারী চাকুরী করতে হলে তাঁকে কোটের সঙ্গে প্যান্ট পরতে হবে, ধুতি পরলে চলবে না। সেই প্রস্তাব শুনে গঙ্গাপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে চাকুরি নিতে অস্বীকার করলেন—যদিচ সরকারী কাজ প্রত্যাখ্যান করার মতো তাঁর তখন অবস্থা ছিল না।

ছাত্রের প্রতি স্নেহবশত প্রিন্সিপাল তাঁর নাম সুপারিশ করে তাঁকে যে মিলিটারি সেক্রেটারির কাছে পাঠিয়েছিলেন—সেই সুবাদে গঙ্গাপ্রসাদ সোজা মেডিকেল কলেজে চলে এলেন স্যর চার্লসকে ধন্যবাদ জানাতে। সেই সঙ্গে নিজে কি স্থির করেছেন সেকথা বলতে গিয়ে বললেন যে মিলিটারি সেক্রেটারি ডাক্তার চান না—চান একজোড়া ট্রাউজার।

পিতার আত্মসম্ভ্রম জ্ঞান, স্পষ্টবাদিতা ও সৎসাহস প্রভৃতি গুণের জন্য আশুতোষ পিতাকে খুবই সমীহ ও শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর নিজের জীবনে যখনই সংকট ও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে, তিনি প্রমাণ করেছেন পিতার উপযুক্ত পুত্র কাকে বলে।

সরকারী চাকুরী প্রত্যাখ্যান করার পর গঙ্গাপ্রসাদ দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে রসা রোডের উপর (অধুনা আশুতোষ রোড) একটি বাড়ি খরিদ করে সেখানেই প্র্যাকটিস শুরু করেন।

চাকুরী না নিয়ে যেন শাপে বর হল, কারণ অল্প কিছুদিনের মধ্যেই

ভবানীপুরে তাঁর প্র্যাকটিস জমে উঠল। গঙ্গাপ্রসাদ সে অঞ্চলের একজন মান্যগণ্য ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হলেন। ডাক্তারীতে তাঁর যেমন হাতযশ, দয়াদাক্ষিণ্যেও তেমনি তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। একটু বদমেজাজী হলে কি হয়, একেবারে স্পষ্টবক্তা মানুষ।

মাতাপিতার স্নেহের ছায়ায় আশুতোষের শৈশব জীবন কাটে। তাঁর মায়ের নাম ছিল জগত্তারিণী। পরিবার পরিজন ও রোগীদের হরদম যাতায়াতের ফলে বাড়ি সরগরম থাকত বটে, কিন্তু গঙ্গাপ্রসাদের নিয়মনিষ্ঠ কড়া শাসনের ফলে সংসার চলত সুশৃঙ্খলায়। এই বাড়ির একটি ঘরে বালক আশুতোষ থাকতেন মশগুল হয়ে তাঁর কল্পনার জগতে। তাঁর সঙ্গী সাথী বড় কেই ছিল না বলে, তিনি বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকতেন। বাবা তাঁর এই বইপড়ার বাতিক খুব পছন্দ করতেন, উৎসাহ দিতেনও খুব। গঙ্গাপ্রসাদের প্রাণের বাসনা ছিল তাঁর ছেলে যেন সুশিক্ষিত হয়। পরবর্তী জীবনে সাহিত্য, ইতিহাস, ব্যবহার শাস্ত্র, দর্শন, শিক্ষা, গণিত ও বিজ্ঞান নিয়ে নানা ভাষায় লেখা বিরাট যে গ্রন্থরাজি ও পত্রপত্রিকা আশুতোষ সংগ্রহ করে-ছিলেন, সম্ভবত তার মূলে ছিল তাঁর পিতার উৎসাহ ও তাঁর নিজের পড়ার বাতিক। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে তাঁদের পিতার এই বিরাট গ্রন্থ সংগ্রহ, পুত্র রমাপ্রসাদ, শ্যামাপ্রসাদ, উমাপ্রসাদ ও বামাপ্রসাদ কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিকে দান করেন। স্থির হয় এই অমূল্য গ্রন্থরাজি পণ্ডিত ও গবেষকদের ব্যবহারের জন্য একটি পৃথক সংগ্রহরূপে রক্ষিত হবে। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এই বিরাট ৭২,০০০ গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা সংগ্রহ দানরূপে গ্রহণ করেন তখনকার শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। মুখোপাধ্যায় ভ্রাতাদের কাছে একটি চিঠিতে তিনি বলেছিলেন, "আপনাদের এই উদার্যের দান পেয়ে ভারত সরকার বিশেষ বাধিত এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি আনন্দিত।"

চক্রবেড়িয়া শিশু বিদ্যালয়ে আশুতোষের পাঠারম্ভ। সমবয়সী ছেলেদের

সঙ্গে খেলাধূলায় তাঁর কোনো উৎসাহ ছিল না, তাঁর শরীর চর্চার একমাত্র উপায় ছিল দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে বেড়ানো। শোনা যায় স্যাডলার কমিশন-এর রিপোর্ট যখন প্রস্তুতির মুখে, স্যর মাইকেল বহুদিন সকালবেলায় গিয়ে আশুতোষকে ময়দানে ধরতেন এবং সেখানে পদচারণরত আশুতোষের সঙ্গে রিপোর্ট-এর শক্ত শক্ত অংশ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন।

শিশু বিদ্যালয়ে যখন তিনি ছাত্র, আশুতোষের শরীর খারাপ হওয়ায় পিতা গঙ্গাপ্রসাদ তাঁকে হাওয়া বদলের জন্য মথুরা পাঠিয়ে দেন। কলকাতা ফেরবার পথে আকস্মিকভাবে মোগলসরাই জংসনে বাংলার সকল শিক্ষার্থীর আদর্শপুরুষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর চাক্ষুষ পরিচয় ঘটে। তখন তাঁর বয়স মাত্র দশ বৎসর, কিন্তু এই সাক্ষাৎকারের আনন্দস্মৃতি আজীবন তাঁর মনে উজ্জ্বল ছিল।

আশুতোষের ভবিষ্যৎ জীবনের গতিপথ অনুধাবন করে দেখলে বুঝতে কষ্ট হয় না যে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দৈবাৎলব্ধ এই পরিচয়ের ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। এই পরিচয়ের একটি প্রতীকী তাৎপর্য আছে—উনিশ শতকের শিক্ষাজগতের নেতৃস্থানীয় মহাপুরুষের সঙ্গে এ যেন বিশ শতকের মুখ্য শিক্ষাবিদের প্রথম মুখোমুখি পরিচয়। দশ বছরের বালকের মধ্যে বিদ্যাসাগর নিশ্চয় অসাধারণ কিছু দেখে থাকবেন, তা না হলে কলকাতার একটি বইয়ের দোকানে দ্বিতীয়বার দেখা হলে পর, তিনি আশুতোষকে কেনই বা এক কপি রবিনসন ক্রুশো উপহার দিতে গেলেন। এই উপহার পুস্তকটি ছিল বালক আশুতোষের অত্যন্ত আদর ও গর্বের সামগ্রী।

১৮৭৬ সালে বারো বছর বয়সে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ শেষ করে আশুতোষ সাউথ সাবার্বন স্কুলের ফোর্থ ক্লাসে ভর্তি হন। এইখানে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো একজন বিখ্যাত হেডমাষ্টারের অধীনে তাঁর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা শুরু হয়। তিনি কেবল শিক্ষক ছিলেন না, সমাজ

সংস্কারকও ছিলেন। লেখক হিসাবেও তাঁর কৃতি কিছু কম ছিল না, তাঁর রচিত 'রামতনু লাহিড়ি ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থটি উনিশ শতকের বাঙালী সমাজের একটি প্রকৃষ্ট ইতিহাস। হেডমাষ্টার হিসাবে তিনি পেয়েছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রীকে আর গৃহশিক্ষকরূপে পেয়েছিলেন মধুসূদন দাসকে। ইনি পরে ওড়িষ্যার সাহিত্যিক ও বিদ্বৎসমাজের নেতা হয়ে সকল দেশের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন।

আশুতোষের জীবনাদর্শ গঠনে যাঁদের প্রভাব সর্বাগ্রগণ্য—তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় পিতা গঙ্গাপ্রসাদ ও মাতা জগত্তারিণী। তাঁর আত্মসম্ভ্রমবোধ, নির্ভীকতা ও উদার হৃদয়বত্তা তিনি পেয়েছিলেন পিতার কাছ থেকে। জীবনযাপনে নিয়মনিষ্ঠা ও বিপুল কর্মশক্তি—তাও তিনি পিতার উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। মাতা জগত্তারিণী ছিলেন অল্প কথার মানুষ কিন্তু শক্তি ছিল তাঁর অসাধারণ। পুত্রের চরিত্র গঠনে তাঁর প্রভাবও সামান্য ছিল না। উভয়ের মধ্যেকার সম্বন্ধ এতই গভীর ছিল যে যখনই ব্যক্তিজীবনে গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আশুতোষকে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে, তিনি জগত্তারিণীর নির্দেশ কিংবা অনুমোদন ভিক্ষা করেছেন।

অপ্রত্যক্ষ হলেও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রভাব কিছু কম ছিল না। বলা যেতে পারে পরবর্তী প্রজন্মের উপর বিদ্যাসাগরের প্রভাব গভীর হবে এতে আর. বিচিত্র কী! কিন্তু আশুতোষের উপর বিদ্যাসাগরের যে প্রভাব পড়েছিল সে যেন তাঁর বিশেষ ব্যক্তিত্বের প্রভাব এবং সে যেন বিশেষ ব্যক্তির উপরেই প্রতিফলিত হয়েছিল, পরবর্তীকালে আশুতোষের কর্মজীবনে।

শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রভাব পড়েছিল ওতপ্রোতভাবে সাউথ সাবার্বন স্কুলের উপর অর্থাৎ সেই স্কুলের শিক্ষার্থীদের উপরেও। উঠতি বয়সে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এসে আশুতোষ নিশ্চয় উপকৃত হয়ে থাকবেন। মধুসূদন

দাস সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়, উপরন্তু উল্লেখ করা যায় যে ১৯২৪ সালে ইনি এঁর প্রখ্যাত ছাত্রটিকে প্রত্যক্ষ রাজনীতির কাজে যোগ দেওয়াবার জন্য প্রয়াস পেয়েছিলেন।

১৮৭৯ সালে পনেরো বছর বয়সে, উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করে আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। তাঁর এই কৃতিত্বের ফলে তিনি প্রথম শ্রেণীর একটি বৃত্তি লাভ করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

মেধাবী ছাত্র

কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ ছিল বাংলার প্রথম কলেজ। ইটন ও হ্যারোর মতো প্রেসিডেন্সি কলেজও বাংলার কৃতী সন্তানদের পালয়িত্রী হয়েছিল বলা যায়। বৃত্তিধারী মেধাবী ছাত্ররূপে তরুণ আশুতোষ নিজস্ব কৃতিত্ব গুণে স্বাধিকারে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশলাভ করেছিলেন।

পূর্ববর্তী যুগের হিন্দু কলেজ থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজের জন্ম। উভয় কলেজেরই অধ্যাপকেরা ছিলেন নিজ নিজ বিষয়ে দিক্‌পাল, ছাত্রেরাও ছিল সবার সেরা। আশুতোষ যখন ছাত্র সেই সময় প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপকবর্গের মধ্যে ছিলেন অধ্যক্ষ টনি যাঁর পুত্র লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্‌স-এ অর্থনীতির ঐতিহাসিকরূপে নাম করেছিলেন; গণিতজ্ঞ উইলিয়ম বুথ, এফ-জে রো, ডবলিউ এইচ ম্যাক্‌কান, ডবলিউ টি ওয়েব, প্যারীচরণ সরকার, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী এবং ইংরেজী সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক ভারতীয় খ্রীষ্টান এইচ. এম, পার্সিভাল। অবসর নেবার পর পার্সিভাল বিলেতেই বসবাস করতেন। আশুতোষের আমন্ত্রণক্রমে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ইংরেজী বিভাগের প্রধানরূপে যোগ দিয়েছিলেন। এ থেকে বুঝতে পারা যায় পার্সিভাল-এর প্রতি আশুতোষের শ্রদ্ধা কতখানি গভীর ছিল।

কেবল অধ্যাপক সম্প্রদায়ই নয়, সে সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রসম্প্রদায়ের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন যাঁরা পরে হাইকোর্টের জজ হিসাবে, আইনজীবি, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক কিংবা অধ্যাপক হিসাবেও প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আশুতোষের চেয়ে বয়সে কিঞ্চিত বড় অথচ তাঁরই সমকালীন ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন ব্যোমকেশ চক্রবর্তী; আশুতোষ

চৌধুরী (জেনারেল জয়ন্ত নাথ চৌধুরী এঁর ভ্রাতুষ্পুত্র); পরবর্তীকালে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া কাউন্সিল-এর অন্যতম সদস্য ভূপেন্দ্রনাথ বসু; আবতুর রহিম—যিনি পরে মাদ্রাজের প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন; হেরম্বচন্দ্র মৈত্র যাঁর জামাতা প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের নাম বিজ্ঞানজগতে সুপরিচিত; প্রখ্যাত রসায়নশাস্ত্রবিৎ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়; এবং কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সার্জন সুরেশ প্রসাদ সর্বাধিকারী।

হয়তো অনেকেই অবগত নন যে নরেন্দ্রনাথ দত্ত (পরে যিনি স্বামী বিবেকানন্দ নামে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিলেন) ১৮৮০ থেকে ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজেরই ছাত্র ছিলেন এবং আশুতোষ ছিলেন তাঁর সহপাঠী।

১৮৮১ সালে আশুতোষ শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও এফ. এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। যথাক্রমে ১৮৮৪ ও ১৮৮৫ সালে তিনি বি. এ. ও এম. এ. ডিগ্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। উভয় পরীক্ষায় তাঁর বিশেষ অধীত বিষয় ছিল গণিত এবং উভয় পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৬ সালে তিনি পদার্থবিজ্ঞানেও এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন।

সেই বছরেই তাঁর ব্যক্তিজীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। তিনি কৃষ্ণনগরের পণ্ডিত রামনারায়ণ ভট্টাচার্যের কন্যা যোগমায়াকে বিনা পণে বিবাহ করেন। যৌতুক নিতে অস্বীকার করায় পিতা গঙ্গাপ্রসাদ খুবই খুশি হয়েছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সে সময় যাঁরা উপাচার্য হয়েছিলেন তাঁদের প্রত্যেকে আশুতোষের গণিত প্রতিভা ও কৃতিত্বের বিষয়ে শতমুখে প্রশংসা করেছেন। দুঃখের বিষয় জীবনযাত্রার নানা বিঘ্নবিপত্তির ফলে, গণিতে তিনি যেসব গবেষণার সূত্রপাত করেছিলেন সেগুলি সম্পূর্ণ করতে পারেননি।

১৮৮৩ থেকে ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন এইচ.

জি. রেণলড্‌স্‌। তিনি ১৮৮৪ সালের সমাবর্তন ভাষণে বলেন : "কেমব্রিজ-এর ভাষায় গণিতে যিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন তাঁকে বলা হয় সীনিয়র র‍্যাংলার। সেই অর্থে বর্তমান বছরে গণিতে যিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছেন, প্রেসিডেন্সি কলেজের সেই আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে আমরা এ বছরের সীনিয়র র‍্যাংলার বলতে পারি। তাঁর কৃতিত্বের গুণে তিনি ঈশান বৃত্তি, ভিজিয়ানগ্রাম বৃত্তি এবং হরিশচন্দ্র পুরস্কার পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছেন।"

১৮৮৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মানরূপে স্বীকৃত প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্টুডেন্টশিপ তাঁর হস্তগত হয়। গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞানে এম. এ. ডিগ্রী ও পি. আর. এস. লাভ করেও তিনি তৃপ্ত থাকতে পারেননি। কলা বিভাগের তিন-তিনটি বিষয়ে পি. আর. এস পরীক্ষায় বসবার অনুমতি চেয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আবেদন পত্র পাঠিয়েছিলেন। সিণ্ডিকেট তাঁকে সে অনুমতি দেননি। জ্ঞানবিজ্ঞানের বিষয় ছাড়া ভাষা আয়ত্ব করার জন্যও তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি ফরাসী ও জর্মন ভাষা ভালো করে শিখেছিলেন।

গণিতে তাঁর অদ্ভুত প্রতিভার কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেইসব কথা শুনে তখনকার ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাক্‌শন স্যর অ্যালফ্রেড ক্রফট্‌ আশুতোষকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন। কথা-বার্তায় সন্তুষ্ট হয়ে তিনি আশুতোষকে তাঁর নিজের কলেজ অর্থাৎ প্রেসিডেন্সি কলেজেরই অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত করতে চান। কিন্তু প্রস্তাবটা কার্যকর করা গেলনা। আশুতোষ জানতেন তাঁর পঠিত বিষয়ে তিনি আর কারো কম নন, সুতরাং তিনি বললেন মাহিনা ও পদমর্যাদায় ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস-এর সাহেব অধ্যাপকদের সমপর্যায়ভুক্ত না করলে তিনি স্যর অ্যালফ্রেড-এর প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেননা। স্যর আলফ্রেডও সেরকম কোন প্রতিশ্রুতি দিতে না পারায়, ধরে নেওয়া হল আশুতোষ

যেন গণিত অধ্যাপক পদের জন্য প্রার্থী হতে চাননি। আশুতোষ জীবনীকার নির্মলকুমার সিংহ এই ঘটনা বিবৃত করতে গিয়ে এই প্রকার লিখেছেন।

উচ্চশিক্ষার প্রসারে তিনি যে ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, তার অন্যতম লক্ষ্য ছিল যেন শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতি বা বর্ণগত বৈষম্যের ফলে পক্ষপাত বা তারতম্য না ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করার অব্যবহিত পরের এই ঘটনা হয়তো তাঁর এই সংকল্পের সূত্রপাত করে থাকবে।

স্যর অ্যালফ্রেড স্বাধীনচেতা আশুতোষের কৌলিন্য মর্যাদার দাবী সহানুভূতির চোখে দেখতে পারেন নি। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, তিনি খুবই চেষ্টা করেছিলেন যেন আশুতোষের মনোগত বাসনা পূরণ করে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে গবেষক অধ্যাপকরূপে গ্রহণ করা হয়। এই প্রস্তাবের ঘোরতর বিরোধিতা করেছিলেন যাঁরা, স্যর অ্যালফ্রেড ক্রফট্ ছিলেন তাঁদের অগ্রণী।

১৮৮৬ সালে আশুতোষকে গণিতে এম. এ. পরীক্ষার অন্যতম পরীক্ষক-রূপে নিযুক্ত করা হয়।

১৮৮৭ থেকে ১৮৯২ সাল পর্যন্ত আশুতোষ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্‌টিভেশন অব সায়েন্স সংস্থায় উচ্চ কোটির গণিতের উপর ধারাবাহিক বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রিত হন। আমন্ত্রণ করেছিলেন ডক্‌টর মহেন্দ্রলাল সরকার। তিনি গুণগ্রাহী ছিলেন বলে, কারো সত্যকার প্রতিভা থাকলে তাঁকে খুঁজেপেতে ধরে নিয়ে আসতেন তাঁর সংস্থায়। আশুতোষের বক্তৃতামালার সপ্রশংস উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, "কলকাতার যেসব কলেজে এম. এ. গণিত পড়ানো হয় সেইসব কলেজের, এমন কি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রেরা, এই বক্তৃতামালা শোনার জন্য নিয়মিত উপস্থিত থেকেছেন ও শুনে লাভবান হয়েছেন।" দুঃখের বিষয় জীবিকা সন্ধানের তাগিদ থাকায় এই বক্তৃতামালায় ছেদ পড়ে ১৮৯২ সালে।

আশুতোষ বুঝেছিলেন তাঁকে এমন কোনো জীবিকা সন্ধান করে নিতে হবে যেখানে পরমুখাপেক্ষী হতে হবে না, স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জন করা সম্ভব হবে। সেই জন্য আইনের দিকে তিনি যে ঝুঁকবেন, সে ছিল এক-প্রকার স্বতঃসিদ্ধ। শাস্ত্র হিসাবে গণিত শাস্ত্র ও ব্যবহার শাস্ত্রের খুবই নিকট সম্বন্ধ—দুই শাস্ত্রের সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণের উপর সমস্যার সমাধান নির্ভর করে। সুতরাং গণিতে জীবিকার সংস্থান যদি দুরূহ হয়, তাহলে ব্যবহার-জীবী হবার কথা নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর মনে উদয় হয়ে থাকবে।

বি. এল. পরীক্ষা তিনি পাশ করেছিলেন সিটি কলেজ থেকে। সে কলেজে তখন যাঁরা আইন পড়াতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, পরে যিনি পরিচিত হন লর্ড সিংহ নামে।

আশুতোষ পর পর তিন বছরের (১৮৮৪, ১৮৮৫ ও ১৮৮৬ সালের) পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে টেগোর গোল্ড মেডেল লাভ করেন।

১৮৯৪ সালে তিনি ডকট্‌র অব ল ডিগ্রী লাভ করেন। তার তিন বছর পরে ১৮৯৭ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে টেগোর ল প্রফেসর নিযুক্ত হন। প্রফেসর হিসাবে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতাবলী পুস্তক আকারে প্রকাশিতও হয়। এই পুস্তকের নাম The Law of Perpetuities in British India.

চতুর্থ অধ্যায়

গণিতিক প্রতিভার অপচয়

ডক্টর আর. পি. পরঞ্জপে স্বয়ং ছিলেন একজন সিনিয়র র‍্যাংলার। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "তিনি যদি কেবলমাত্র গণিত চর্চায় মনোনিবেশ করবেন বলে মনস্থির করতেন, তাহলে পৃথিবীর গণিতশাস্ত্রীদের শীর্ষভাগে তাঁর আসন যে নির্দিষ্ট হত সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।" এ বিষয়ে যাঁদের মত দেবার অধিকার ছিল তাঁদের অনেকেই আশুতোষের গণিত প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেছেন।

গণিতের প্রখ্যাত অধ্যাপকদের কাছে তাঁর শিক্ষাদীক্ষা। কলেজ জীবনের একপ্রকার শুরু থেকেই গণিতে তিনি গবেষণা আরম্ভ করেন, এবং ছাত্রাবস্থাতেই দেশের ও বিদেশের বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকায় প্রায় বাইশটি মৌলিক নিবন্ধ প্রকাশ করেন। গণিতের খ্যাতনামা অধ্যাপক ডক্টর আর. এন. সেন আশুতোষের এই ছাত্র বয়সের কৃতি বিষয়ে উল্লেখ করে বলেছেন, "গণিতের ইতিহাসে এই রকম কৃতিত্বের উদাহরণ খুবই বিরল।"

তাঁর প্রথম নিবন্ধ প্রকাশিত হয় কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশুদ্ধ ও ফলিত গণিত পত্রিকা The Messenger of Mathematics-এ। সম্পাদকীয় টীকায় বলা হয়েছিল যে, "লেখক ইউক্লিড-এর পঁচিশ নম্বর প্রতিজ্ঞার একটি নূতন ও পরিচ্ছন্ন প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন।" আশুতোষের তৃতীয় নিবন্ধে তিনি উপবৃত্তের কারকতা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। এই লেখাটির বিষয়ে অধ্যাপক কালে বলেছিলেন, "একটি কল্পিত বিন্দুর উপর নির্ভর করে গবেষক যেভাবে একটি বাস্তব সিদ্ধান্তে

উপনীত হয়েছেন—তা সত্যই উল্লেখযোগ্য। এন্নেপার তাঁর Elliptische Funktionen প্রবন্ধে এই লেখাটি উল্লেখ করেছেন।”

তাঁর অপর একটি প্রবন্ধ “On the differential equation of trajectory” অর্থাৎ আবক্র পথচারণের অন্তর সমীকরণ—আন্তর্জাতিক গণিত সমাজে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল। গণিতে এম. এ. ডিগ্রী লাভের অব্যবহিত পরেই তিনি এটি লিখেছিলেন। মাইনহার্দি নামে একজন বিখ্যাত ইতালিয়ান গণিতিক এই বিষয়ে যে প্রমাণ উপস্থিত করেছিলেন, আশুতোষ তাঁর একটি বিকল্প প্রমাণ দেখিয়েছিলেন তাঁর সেই নিবন্ধে। তাঁর এই নিবন্ধবিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ লিখেছিলেন, “আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এমন একটি উপায় উদ্‌ভাবন করেছেন যার সাহায্যে মাইনহার্দির জটিল প্রমাণের বিকল্পে দুটি সহজ সমীকরণের দ্বারা সমস্ত সমস্যার সুমীমাংসা হতে পারে। উপরন্তু এই সমীকরণ জ্যামিতিক পদ্ধতিতেও প্রমাণসহ। অধ্যাপক ফোরসাইথ তাঁর Differential Equation গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণগুলিতে আশুতোষের এই সমীকরণ উদ্ধৃত করেছেন।” আশুতোষের গণিত প্রতিভার অপরাপর প্রমাণ এখানে উল্লেখ না করে, তাঁর বিষয়ে অধ্যাপক গণেশ প্রসাদের মতো একজন বিখ্যাত ভারতীয় গণিতিক কী বলেছেন, সেইটুকু অনুধাবন করলেই যথেষ্ট। গণেশ প্রসাদ বলেন, “গণিত শাস্ত্রে স্যর আশুতোষ যতটুকু দান করেছেন, সে তাঁর ছাত্র বয়সের একক প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ। ভাস্করের পরবর্তীকালে তিনি হলেন প্রথম ভারত সন্তান যিনি গণিতিক গবেষণার ক্ষেত্রে (জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে নয়) অনেক কিছু দিয়ে গেছেন যা মৌলিক বলেই মূল্যবান।”

আশুতোষ প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করে জ্যামিতিক কণিক-এর উপর যে বই লিখেছিলেন, সেই বই ১৮৯৩ সালে ম্যাকমিলানরা প্রকাশ করেন। এ বইয়ের সংস্করণের পর সংস্করণ হয়েছে এবং Nature ও অন্য পত্রিকায় এর ভূয়সী প্রশংসাসূচক আলোচনাও বেরিয়েছে।

আশুতোষ বাংলার রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য তো ছিলেনই, বেশ কয়েক বছর ধরে সভাপতিও ছিলেন। এছাড়া তিনি এডিনবরা রয়েল সোসাইটি ও রয়েল অ্যাস্ট্রনমিকাল সোসাইটিরও 'ফেলো' নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং রয়েল আইরিশ একাডেমির সদস্য ছিলেন। উপরন্তু লণ্ডন, এডিনবরা, প্যারিস, পালের্মো ও নিউ ইয়র্ক-এর ম্যাথামেটিকেল সোসাইটিগুলিরও তিনি সদস্যরূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৯০৮ সালে কলকাতার ম্যাথামেটিকেল সোসাইটি তিনিই স্থাপন করেন এবং সূচনা থেকে আজীবন এই সোসাইটির সভাপতিও ছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

জীবিকা নির্বাচন

পুরাতন দিনের কথা স্মরণ করতে গিয়ে আশুতোষ ১৯২০ সালে বলেছিলেন, "আমার কাছে আমার বিশ্ববিদ্যালয় তখন যেমন প্রিয় ছিল, এখনো তেমনি। এর চেয়ে প্রিয়তর কোনো কিছুর কথা আমি ভাবতেও পারি না। এদেশে গবেষণার বিষয়ে বড় একটা কেউ যখন জানতই না সেই সময়ে আমি আমার কর্মজীবন শুরু করি গণিতের গবেষক ছাত্ররূপে। আমার উচ্চাশার চরিতার্থতা ঘটতো যদি কোনো দিন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি গবেষক অধ্যাপকরূপে যোগ দিতে পারতাম। জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তখন ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তিনি আমার জন্য একটি 'চেয়ার' প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্রচুর পরিশ্রম করেছিলেন। কিন্তু সে সময়ে টাকার এমনি টানাটানি যে বছরে চার হাজার টাকা আমদানী হবে এমন একটি অনুদান পর্যন্ত তিনি তখন সংগ্রহ করে উঠতে পারেননি। তিনি ও আমি আমরা উভয়েই ভেবেছিলাম গবেষক অধ্যাপকরূপে আমি বছরে যদি চার হাজার পাই—তাই হবে যথেষ্ট। কিন্তু আমাদের এই সামান্য আশাটুকুও পূরণ হলো না বলে বাধ্য হয়ে আমাকে আইন জগতে চলে আসতে হল।"

প্রখ্যাত আইনবিদ্ স্যর রাসবিহারী ঘোষের কাছে নির্দিষ্টকাল শিক্ষানবিশী করার পর ১৮৮৮ সাল থেকে আশুতোষ কলকাতা হাইকোর্টের উকিল হিসাবে প্র্যাক্‌টিস শুরু করলেন।

পরের বছর ১৮৮৯ সালে পিতার মৃত্যু হওয়ায় নূতন জীবিকায় কৃতী হবার জন্য তিনি দৃঢ়সংকল্প হলেন।

পসার ক্রমে বৃদ্ধি পেতে লাগল। অনুকূল হাওয়ায় পালতোলা তরণীর মতো জীবিকার তরণী তর তর করে বয়ে যেতে লাগল। এই তরণীর কর্ণধার হয়েছিলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। আশুতোষ নিজেই বলেছেন, "আমার কর্মজীবন তাঁর হাতে অনেকখানি গড়া।"

আশুতোষকে আইনজীবী হতে হয়েছিল খানিকটা বাধ্য হয়েই। যদি তেমন সুযোগ সুবিধা থাকত এবং ঘটনাচক্র যদি ইপ্সিত পথে চলত, তা হলে হয়তো গণিতের গলাতেই তিনি মালা দিতেন—কারণ, গণিত ছিল তাঁর প্রথম প্রেম। সে যাই হোক না কেন, গণিতশাস্ত্র ও ব্যবহার-শাস্ত্রের একটি যে মিলের কথা ইতিপূর্বে বলেছি, বোধকরি তারই আকর্ষণে তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিশ্লেষণ শক্তি সাড়া দিয়েছিল।

সর্বশেষে স্বীকার করতেই হয় আর্থিক সচ্ছলতা ব্যতিরেকে চিত্তের স্বাধীনতা রক্ষা করে চলা যে কত কঠিন—সে কথা আশুতোষ ভালো করেই বুঝেছিলেন নিশ্চয়।

তাঁর প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি, বৈদগ্ধ্যের প্রসার, অদম্য কর্মশক্তি ও সাহস যে কোনো ক্ষেত্রে তাঁকে সাফল্যের পথে নিয়ে যাবে—এতো স্বতঃসিদ্ধ। হাইকোর্টের কৃতী উকিল হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠালাভের বিলম্ব হয়নি, সেখানকার পরিবেশও তাঁর স্বভাবের অনুকূল হয়েছিল।

তাঁর সময়ে কলকাতা হাইকোর্ট ছিল যেন শহরের প্রাণকেন্দ্র। প্রাক্‌টিস যাঁরা করতেন তাঁদের অনেকে আইনের জ্ঞান ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও দিক্‌পাল ছিলেন। ভারতীয় উকিল, জজ ও ব্যারিষ্টরদের মধ্যে ছিলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তারকনাথ পালিত, রাসবিহারী ঘোষ ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ইংরেজদের মধ্যে ছিলেন তন্ত্রশাস্ত্রের সুবিখ্যাত পণ্ডিত এবং Is India Civilized ? গ্রন্থের লেখক উড্রফ, জ্যাকসন, পল ও গার্থ প্রভৃতি।

মাত্র চল্লিশ বছর যখন তাঁর বয়স, তখন ব্যবহার শাস্ত্রে তাঁর প্রতিভা মধ্যগগনে, সেই সময়ে আশুতোষ হাইকোর্ট-এর জজ নির্বাচিত হন। জজ নিযুক্ত হবার মর্যাদা নিঃসন্দেহে উঁচু, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এর ফলে তাঁর উপার্জন অনেকখানি হ্রাস পায়। ফী হিসাবে তিনি যা উপার্জন করতেন জজ-এর দক্ষিণা তার তুলনায় অনেক কম। কিন্তু সানন্দচিত্তে তিনি এই স্বার্থবিসর্জনের পথ বেছে নিলেন মুখ্যত এই আশায় যে হাইকোর্টের জজ হিসাবে তাঁর পদমর্যাদা তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবায় নিয়োজিত করতে পারবেন।

সরকার যে তাঁকে জজ হিসাবে নির্বাচন করলেন, তার পিছনে হয়তো কোনো অভিসন্ধি থেকে থাকবে এমন কথা বলা অসঙ্গত হয় না। কেবল তাঁর প্রখর আইন জ্ঞান এবং কালবিলম্ব না করে মামলার একেবারে ভিতরে প্রবেশ করার শক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে সরকার যে এমনটা করলেন তা হয়তো ঠিক নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য যখন অদূর ভবিষ্যতে নিয়োগ করতেই হবে—আশুতোষের মতো সর্বগুণসম্পন্ন একজনকে বাদ দিয়ে ভাবাই চলে না। ভারত সরকারের হোম মেম্বর মিঃ (পরে স্যর) এইচ. এইচ. রিসলী, তাঁর একটি বিশেষ অনুধাবনযোগ্য চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ "সর্বশেষে আমি বলতে চাই যে ভাইস চ্যান্সেলর হিসাবে একজন হাইকোর্ট-এর জজকে নিযুক্ত করার বহু সুবিধা। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সেনেট-এ রাজনীতিক কারণ নিয়ে যাঁরা মাতামাতি ও দলাদলি করেন, তাঁদের অধিকাংশ সদস্যই হাইকোর্টের উকিল কিংবা ব্যারিস্টর। সরকার যদি আমলাতন্ত্রী কোন উচ্চ রাজকর্মচারীকে ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত না করে, একজন জজকে নিযুক্ত করেন, তাহলে এইসব বিরোধী-ভাবাপন্ন সদস্যদের বাগে রাখা যায়।"

সরকারের মতিগতি জটিল, নানা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে সরকার

মনস্থির করেন। বাইরে থেকে যা খুবই সহজ বা স্বাভাবিক মনে হয়, তার পিছনেও অনেক চাকার ভিতর চাকা ঘোরে। তবে একটা কথা সত্য, স্যর আলেকজান্দার পেড্‌লার উপাচার্য পদ থেকে অবসর নেবার পর সেই শূন্য পদ অধিকার করার যোগ্যতম ব্যক্তি যে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন, তা নিয়ে কারো সন্দেহ ছিল না। স্যর আলেকজান্দার তো এক-প্রকার ধরেই নিয়েছিলেন যে আশুতোষই হবেন তাঁর স্থলাভিষিক্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

হাইকোর্টের বিচারপতি

আশুতোষ কলকাতা হাইকোর্ট-এর জজ হয়েছিলেন ১৯০৪ সালে এবং জজ-এর পদ থেকে অবসর নিয়েছিলেন ১৯২৩ সালে। ১৯২০ সালে তিনি কিছুকাল বাংলার প্রধান বিচারপতি হিসাবে কাজ করেছিলেন। ১৯১১ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক তিনি 'স্যর' উপাধিতে ভূষিত হন।

বিচারপতির আসনে থাকাকালে তিনি হাজার দুয়েকের উপর মামলা নিষ্পত্তি করে 'রায়' দিয়েছিলেন। এই সব 'রায়' দিতে গিয়ে আইনের কত দিক নিয়ে তাঁকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিবেচনা করতে হয়েছে, ভাবতেও অবাক লাগে। তাঁর বহু সিদ্ধান্ত প্রামাণ্য নজির হিসাবে আজো স্বীকৃত। পাটনা হাইকোর্ট-এর প্রধান বিচারপতি ডসন মিলার আশুতোষের নিরপেক্ষ সুবিচারের উল্লেখ করে বলেছেন, "তাঁর বিচার নজির হিসাবে উপস্থাপিত হলে হেন বিচারপতি নেই যিনি না সমীহ করেন।"

ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানে আশুতোষের গভীর ব্যুৎপত্তি তাঁর বিচার-দক্ষতার মূলে ছিল। সেইজন্যই তাঁকে বলা হয় "ব্যবহারশাস্ত্রীদের মধ্যে ইতিহাসবেত্তা ও সমাজবিজ্ঞানী।" তিনি জানতেন ইতিহাস ও সমাজ-ব্যবস্থার বিবর্তনের সঙ্গে আইন তাল রেখে চলে, আইন কতকগুলি অনড় অটল বিধানের সমষ্টিমাত্র নয়। পরিবর্তমান সমাজের দিকে সর্বদা লক্ষ্য রেখে তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। ১৯২৩ সালে বারাণসীর এক ছাত্রসম্ভাষণে তিনি বলেছিলেন, "সমাজের সঙ্গে আইনের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ—উভয়ের উদ্ভব একই সময়ে। নানাপ্রকার অসংগতি ও অসম্পূর্ণতার মধ্যে দিয়ে চলতে হলেও, ব্যবহারশাস্ত্রের শেষ ও চরম লক্ষ্য হল তৎকালের সঙ্গে সাযুজ্য সম্পাদন।"

শুধু তাই নয়, তিনি চাইতেন ভারতের আইন শিক্ষার্থীরা যেন ভারতীয় পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সকল দেশের সকল রকম লিখিত আইন— এমন কি শিল্পবাণিজ্য বিষয়ক আমেরিকান আইনও অধ্যয়ন করেন। বারাণসীর আইন-শিক্ষার্থীদের তিনি সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে ভারতের আইন-শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য এমন হওয়া উচিত যাতে তাদের আইনের জ্ঞান সর্বব্যাপী হয়। কেবল হিন্দু অথবা মুসলমান আইন এবং ভারতীয় আইন সভার বিধি ও বিধানের মধ্যে তাঁরা যেন আবদ্ধ না থাকেন। ইংরেজী আইনের মূলনীতি যেমন জানা দরকার, তেমনি জানতে হবে ইংরেজী আইনের বিবর্তনের ইতিহাস। কেবল ইংলণ্ড কেন, অপর যে-কোনো দেশের আইনের দ্বারা ভারতীয় বিধি বা বিধান যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে প্রভাবিত হয়, তাহলে সেইসব আইনও ভারতীয় শিক্ষার্থীর পাঠক্রমের অন্তর্গত হওয়া উচিত।

তাঁর নিজের মতে আইন হল মূলত নীতিবিজ্ঞান। মানুষের সমাজ বিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য রেখে যে আইনজ্ঞ এইসব নীতির সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির সাযুজ্য ঘটাতে পারবেন, তিনিই সুদক্ষ ব্যবহারজীবী। তাঁর ন্যায়পরায়ণতা হবে তাঁর পাণ্ডিত্যের বিশুদ্ধতার পরিমাপে। তাঁর নিজের ক্ষেত্রে এই দুটি গুণের পরিপূর্ণ সমন্বয় ঘটেছিল বলেই আজো তিনি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারকদের মধ্যে অন্যতম বলে স্বীকৃত।

উপরন্তু তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে সুবিহিত ভাবে আইন অধ্যয়নের ব্যবস্থা হলে দেশের উন্নতিও অবধারিত। ১৯২৩ সালে প্রদত্ত তাঁর সেই সুবিখ্যাত অভিভাষণের অন্যত্র তিনি বলেছিলেন, "ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আমেরিকার ঔপনিবেশিকেরা যে দুর্দমনীয় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে এডমণ্ড বার্ক বলেছেন আমেরিকার শিক্ষা পদ্ধতিতে আইন অধ্যয়নের ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল তার অন্যতম কারণ।"

তিনি আরো বলেছিলেন, "আইন অধ্যয়ন মানুষের বুদ্ধিকে শাণিত করে,

অনুসন্ধিৎসা জাগায়, দক্ষতা বৃদ্ধি করে, দ্রুত আক্রমণে মানুষকে যেমন পটু করে তেমনি আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তাকে প্রস্তুত রাখে, সকল অবস্থায় সকল রকম উপায় উদ্‌ভাবনে তৎপর করে।" এইসব কথা তাঁর নিজের সম্বন্ধে ও যে সকল আইনজ্ঞ দেশের মুক্তিযুদ্ধে অগ্রণী হয়েছিলেন—তাঁদের সম্বন্ধেও বিশেষভাবে প্রযোজ্য। আজকের দিনেও এই শ্রেণীর আইনজ্ঞরা দেশের প্রভূত উপকার সাধন করে চলেছেন।

আশুতোষের জীবনীকার ডক্টর এন. কে. সিংহের লেখা থেকে একটি উদ্ধৃতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য: "মামলার বিষয় যাই হোক না কেন, ডক্টর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হত যে আইনের ব্যাখ্যায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। আমলাতন্ত্রীদের অনাচার উদ্‌ঘাটনে তিনি ছিলেন কঠোরভাবে ন্যায়পরায়ণ। সরকার যেখানে বাদী, সেখানে অভিযোগ আনয়নের প্রণালীতে ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। শিষ্ট সম্ভাষণে জজদের 'Learned Judge' বলা হয়ে থাকে; তিনি কিন্তু আক্ষরিক অর্থে বিচারক সমাজে পণ্ডিত ছিলেন। সে সময় হাইকোর্টে পাণ্ডিত্যের সমাদরও ছিল।"

সপ্তম অধ্যায়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

উপাচার্য পদ থেকে স্যর আলেকজান্দার পেড্‌লার-এর অবসর গ্রহণের সময় আসন্ন হওয়ায়, সেই পদে কোনো সুযোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ করার জরুরী প্রয়োজন দেখা দিল। ভারত সরকারের হোম মেম্বর রিসলী যে পেড্‌লার-এর স্থলাভিষিক্ত করার জন্য আশুতোষের নাম সুপারিশ করলেন, তা থেকেই বেশ বুঝতে পারা যায় যে সরকারী মহলে আশুতোষের প্রতিষ্ঠা ছিল কতখানি।

এই বিষয়ে রিসলী যা লিখেছিলেন, তা হল এই: "স্যর আলেকজান্দার মার্চ মাসের শেষ দিকে ভারত ছেড়ে চলে যাবেন। তাঁর পরে কে উপাচার্য হবেন, সে কথাটা এখন থেকেই ভেবেচিন্তে স্থির করা দরকার। গণিত-বিজ্ঞানে যাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব, যিনি দীর্ঘকাল ধরে নানা কাজের সূত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত এবং যিনি বর্তমানে উচ্চ পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত—সেই মাননীয় বিচারপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যে উপাচার্য পদের জন্য সর্বাংশে যোগ্য—একথা আমি মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি। ১৮৮৯ সালের জানুয়ারী মাসে ডক্টর মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' হিসাবে নিযুক্ত হন। তারপর থেকে দীর্ঘ ষোলো বছরেরও বেশি তিনি এক নাগাড়ে সিণ্ডিকেট-এর সদস্য হয়ে আছেন। এই দীর্ঘকালে তিনি একটি মাত্র অধিবেশন ছাড়া সিণ্ডিকেট-এর প্রত্যেক অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন। সেনেট-এর প্রত্যেক সভায় আর্টস ও আইন বিভাগের প্রত্যেক সমিতিতে তিনি উপস্থিত থেকেছেন। গত এগারো বছর ধরে গণিতের পঠনপাঠন সমিতির তিনি সভাপতি। ১৮৮৭ সাল থেকে গণিত ও আইনের উচ্চতম পরীক্ষাগুলি তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেছেন। ১৮৮৯ সাল থেকে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে বাংলার লাট সাহেবের মন্ত্রণা

সভার সদস্য ছিলেন এবং ১৯০৩ থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত বাংলার প্রতিনিধিরূপে বড়লাটের মন্ত্রণা সভার অতিরিক্ত সদস্য ছিলেন। ১৯০২ সালে বাংলার স্থানীয় সদস্যরূপে তিনি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কমিশন-এর সুপারিশ অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় যখন পুনর্গঠিত হয়, তাঁকে কলা, বিজ্ঞান ও আইন এই তিনটি বিষয়েরই শিক্ষা বিভাগে সদস্য নির্বাচন করা হয়। গত কয়েক বছর ধরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অধিনিয়মের ২৫নং উপধারা মতে, সেনেট বিবিধ নিয়মপদ্ধতি রচনার জন্য যে কয়টি সমিতি গঠন করেছেন তার একটি বাদ দিয়ে ডক্টর মুখোপাধ্যায় প্রত্যেকটিরই সদস্যরূপে কাজ করে চলেছেন। এইসব কারণে এবং বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে তার সুবিপুল কার্যবিবরণীর খুঁটিনাটি তাঁর নখদর্পণে থাকায়, তিনি এর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যতটা ওয়াকিবহাল, ততটা আর কেউ নয়। এমন কি বর্তমানে যিনি উপাচার্য পদে অধিষ্ঠিত তিনিও এর অন্যথা নন। বাস্তব পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমিতির কার্য পরিচালনায় ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের উপরেই তিনি সচরাচর নির্ভর করে থাকেন। শিক্ষার্থীরূপেও ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব অসাধারণ—কেবল যে তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেছেন এমন নয়, তিনি আইনে দেশিকোত্তম, উপরন্তু টাগোর ল প্রফেসর। তাঁর নিজের অধীত বিষয় গণিততত্ত্বে তিনি পাশ্চাত্ত্যদেশেও যশোলাভ করেছেন এবং তাঁর মৌলিক গবেষণার একাধিক ফলাফল কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত গণিতবিষয়ক পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

"এই রকম একজন বিশিষ্ট ভারতীয়কে উপাচার্যরূপে নিয়োগ করলে ভারতের জনসমাজ কেবল যে খুশি হবে এমন নয়, সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত বিশ্ববিদ্যালয় অধিনিয়মের একমাত্র উদ্দেশ্য যে দেশীয় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ—সেই ধারণাও কিছু পরিমাণে দূরীভূত হবে। এসব কথা ছাড়াও, আর একটি কথা মনে রাখা একান্তই দরকার।

নিয়মপদ্ধতি প্রণয়নের জটিল কাজ এখন সবেমাত্র শুরু হয়েছে। এই রকম সময়ে এমন একজন উপাচার্য নিয়োগ করা দরকার যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ভালো করে জানেন এবং গত বছরে নিয়মপদ্ধতি নিয়ে যেসব খুঁটিনাটি আলোচনা হয়েছে সে বিষয়েও ভালো করে জানেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছাড়া আমি আর কাউকে জানিনা যিনি এই দুই বিষয়ে আনুপূর্বিক সমস্ত খবরা-খবর রাখেন। সংহত আকারে, পূর্বাপরের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মপদ্ধতি তিনি যেমন নিপুণভাবে প্রস্তুত করতে পারবেন, তেমন আর দ্বিতীয় লোক আমি দেখি না। আমার বিশ্বাস বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ব্যাপারে সরকারী নীতি তিনি যে অনুসরণ করে চলবেন—সে কথা স্বচ্ছন্দে বলা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের কাছে তিনি যে গোপন ও ব্যক্তিগত বিবৃতি পেশ করেছিলেন, তা থেকে দেখা যায় স্যর হেনরী কটন-এর (যদিচ স্যর হেনরীর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো সম্পর্ক নেই) মতো, শিক্ষা ও পরীক্ষার মান ক্ষুণ্ণ করার অপচেষ্টাকে তিনিও ঘোরতর ভাবে নিন্দিত করেছেন। দশ বছর পূর্বে আমি যখন ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের পাশাপাশি সিণ্ডিকেট-এর সদস্য ছিলাম, সর্বদা লক্ষ্য করেছি শিক্ষার মান রক্ষা করার বিষয়ে তিনি কতটা যত্নশীল। সর্বশেষে, আমি বলতে চাই যে উপাচার্য হিসাবে একজন হাইকোর্ট-এর বিচারপতিকে নিয়োগ করার অনেক সুবিধা। সেনেট-এ রাজনীতিক কারণ নিয়ে যাঁরা মাতামাতি কিংবা দলাদলি করেন, তাঁদের অধিকাংশ সদস্যই হাইকোর্ট-এর উকিল কিংবা ব্যারিস্টর। সরকার যদি আমলাতন্ত্রী কোনো উচ্চ রাজ-কর্মচারীকে উপাচার্য নিযুক্ত না করে, একজন জজকে নিযুক্ত করেন তাহলে এইসব বিরোধীভাবাপন্ন সদস্যদের বাগে রাখা যায়।”

কলকাতা হাইকোর্টের-এর জজ নিযুক্ত হবার দু'বছর পরে, অর্থাৎ ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে, আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরূপে নিযুক্ত হন। তাঁর পালয়িত্রী শিক্ষাজননীর তিনি সেবা করবেন,

বাংলায় উচ্চশিক্ষা প্রসারে ব্রতী হবেন বলে তাঁর বহুদিনের আশা এইভাবে সফল হল।

১৯০৬ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত একাদিক্রমে দীর্ঘ আট বৎসর ধরে, তিনি উপাচার্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অতঃপর একটা ছেদ পড়ে প্রথমত দুটি কারণে: সরকারের সঙ্গে তাঁর ঠিক বনিবনা হচ্ছিল না, তাছাড়া অন্য নানা কাজের সঙ্গে তিনি জড়িত হয়ে পড়ায় সময়েরও অভাব ঘটছিল।

১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সরকারের আওতায় আসে। বাংলার লাট লর্ড রোনাল্ডসে (পরে ইনি মার্কুইস অব জেটল্যাণ্ড নামে পরিচিত হয়েছিলেন) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম আচার্য অর্থাৎ চ্যান্সেলর হন।

পূর্বতন বড়লাট লর্ড মিণ্টোর মতো রোনাল্ডসেও ছিলেন আশুতোষের জনৈক গুণগ্রাহী। চ্যান্সেলর হবার অল্পকাল পরেই তিনি আশুতোষকে উপাচার্য পদে পুনর্নিয়োগ করলেন। ১৯২১ সালের ২৯ মার্চ তারিখে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায় এই নিয়োগের কথা ঘোষণা করে তিনি বলেন, "আপনাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়কে ভবিষ্যতে সত্যকার জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে গঠন করার পক্ষে তাঁর চেয়ে যোগ্যতর আর দ্বিতীয় কেউ যে নেই—সে কথা নিশ্চিন্তভাবে বলা যায়।"

কিন্তু এই মধুচন্দ্র যাপনের পালা অচিরে শেষ হয়ে গেল। রোনাল্ডসের জায়গায় যখন লীটন বাংলার লাট তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হয়ে এলেন, তিনি কতকগুলি শর্তাধীনে আশুতোষকে উপাচার্য নিযুক্ত করতে পারেন বলে, সেই মর্মে একটি অপমানকর চিঠি পাঠিয়ে দেন। আশুতোষ ঘৃণায় তাঁর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

লর্ড লীটন এইভাবে গায়ে পড়ে যে অপমান করেছিলেন, তার দরুণ পরে তিনি প্রায়শ্চিত্তও করেছিলেন। আশুতোষের মৃত্যুর পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শোকসভা হয়, চ্যান্সেলর হিসাবে সেই সভার পৌরোহিত্য করতে গিয়ে লীটন বলেছিলেন: "একটা বিরাট বিপর্যয়ের ঘনায়মান

ছায়ার তলায় আমরা আজ সমবেত। আজ আমরা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি। বেদনার্ত হৃদয় নিয়ে, নত মস্তকে আজ আমরা এসেছি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মহত্তম সন্তানের মৃত্যুতে আমাদের শোক প্রকাশ করতে।…… স্যর আশুতোষ তাঁর সমসাময়িক বাংলাদেশের বিশিষ্ট প্রতিভূ ছিলেন…… আজকের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বত্র আমরা দেখছি দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর ব্যাপী তাঁর অক্লান্ত সেবার বিচিত্র পরিচয়……আজকের বিশ্ববিদ্যালয় তাঁরই সেই কাজের পরিণাম……বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগ তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান কীর্তি……বহু বৎসর ধরে বিশ্ববিদ্যালয় অর্থে বুঝাত স্যর আশুতোষ এবং স্যর আশুতোষ অর্থে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।”

অষ্টম অধ্যায়

বিধান পরিষদ ও পৌর প্রতিষ্ঠানে

পূর্বেই বলেছি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আশুতোষের সম্পর্ক সূত্র স্থাপিত হয় তাঁর তরুণ বয়সেই। দীর্ঘ সংসর্গের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত সকল বিষয়ে তিনি সকল রকম খবরাখবর রাখতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যাপার এত ভালো করে জানতেন বলে, মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সে যখন তিনি 'ফেলো' হন এবং সেই একই সময়ে সিণ্ডিকেট ও সেনেট-এর সদস্য নির্বাচিত হন, কেউ তা নিয়ে আশ্চর্য বোধ করেনি। সিণ্ডিকেট ও সেনেট-এর প্রত্যেকটি অধিবেশনে উপস্থিত থেকে তিনি যে নিয়মিত সকল রকম আলোচনায় সক্রিয়ভাবে যোগ দিতেন, সে বিষয়ে ভারত সরকারের হোম মেম্বার-এর মতো একজন দায়িত্বশীল রাজপুরুষ কী বলেছিলেন, সে কথার উল্লেখ ইতিপূর্বে করা হয়েছে।

১৮৯৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় যখন তাঁকে প্রতিনিধি সদস্যরূপে মনোনীত করে বাংলার বিধান সভায় পাঠান, সে মনোনয়ন ছিল আশুতোষের যোগ্যতা ও নিষ্ঠার স্বীকৃতি। ১৯০১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকেই পুন-র্নির্বাচন করেন। ১৯০৩ সালে আবার তিনি প্রতিনিধি সদস্য নির্বাচিত হন বটে, কিন্তু সেবার তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াতে হয় সুরেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দ্বারভাঙ্গা মহারাজের বিরুদ্ধে।

বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে মনোনীত সদস্যরূপে কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়েছিলেন। আইন সম্পর্কিত ব্যাপারে তাঁর কুশলতা ছাড়াও অন্য একটি কারণে হয়তো আশুতোষকে নির্বাচন করা হয়। করপোরেশন

সংক্রান্ত বিল (পরে যা খ্যাত হয় ম্যাকেঞ্জি বিল নামে) নিয়ে বাংলার বিধান পরিষদের বিতর্কে আশুতোষকে সরকার পক্ষের কাছে পরাস্ত হতে হয়।

মনোনীত সদস্য হলে কী হয়, বিধান সভায় আশুতোষ মুখ বুজে থাকার পাত্র ছিলেন না। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি একযোগে ম্যাকেঞ্জি বিল-এর বিরোধিতা করেছিলেন। বিল-এর এক একটি ধারা ধরে ধরে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যদি বিল আইন হিসাবে পাশ করা হয় তাহলে তা হবে জনস্বার্থ বিরোধী ও বৈষম্যমূলক। লর্ড কার্জন-এর অন্য নানা অপচেষ্টার মতো এই ম্যুনিসিপল্ বিল-এরও লক্ষ্য ছিল কলকাতার পৌর প্রতিষ্ঠানকে একটি আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে য়ুরোপীয় বণিক-সমাজের হাতে এর নিয়ন্ত্রণের অধিকার তুলে দেওয়া। অথচ তাতে করে যে ভারতীয় করদাতাদের (যারা সংখ্যায় গরিষ্ঠ এবং করপোরেশন-এর মোটা আয়টুকু যাদের কাছ থেকে আদায় হবার কথা) অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হবে—সেদিকে কর্তৃপক্ষ কোনো দৃষ্টি দেওয়াও প্রয়োজন মনে করেননি। নূতন বিল যে পৌরপ্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসন হরণ করবে—এটা আশুতোষ ঠিকই বুঝেছিলেন।

সাময়িকভাবে যদিচ য়ুরোপীয় বণিক-সমাজের জয় হয়, বিধানসভা যখন পুনর্গঠিত হয় এবং সুরেন্দ্রনাথ স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রী-রূপে নিযুক্ত হন, তিনি এই অন্যায়ের প্রতিকার করেন।

শিক্ষার যেসব ব্যাপার অর্থ-ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত, আশুতোষ তা নিয়েও কম লড়েননি। সরকারের শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের তুলনায়, শিক্ষাবিভাগে মাহিনার হার কম রাখার বিরুদ্ধে তিনি সর্বদা প্রতিবাদ করতেন। একই বিভাগে ইংরেজ কিংবা বিলাতফেরত ভারতীয়দের মাহিনা, অন্যদের চেয়ে কেন বেশী হবে—তা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমার একান্ত আশা ও বিশ্বাস শিক্ষাবিভাগের

প্রাদেশিক কিংবা নিম্নতর স্তরে যে সকল কর্মী রয়েছেন, তাঁদের বেতন ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য একটা সত্যকার চেষ্টা করা হবে।"

সর্বভারতীয় ও প্রাদেশিক চাকুরীর মধ্যে যে বৈষম্য রক্ষা করা হত, তার বিরুদ্ধেও তিনি সমালোচনা করেছেন। ভারতে শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন ভারতীয় বিদ্যায় বুদ্ধিতে বিলাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত অপর কোনো ভারতীয়ের সমতুল্য হলেও, মাহিনার হার স্থির করার সময় একজনকে বলা হত প্রাদেশিক চাকুরে এবং অন্যকে বলা হত সর্বভারতীয় চাকুরে। এই প্রসঙ্গে আশুতোষ বলেছিলেন: "এই দু'জনাকে হয়তো একই কলেজে নিযুক্ত করা হল, একই ধরনের কাজ করতে বলা হল। কেবল মাসের শেষে একজনকে মাইনে দেবার বেলা, দেওয়া হল অপর জনের দ্বিগুণ। এরকম বৈষম্য কেন যে হবে তা আমার বুদ্ধির অগম্য।" সরকার যখন বৃত্তির সংখ্যা ও অর্থমূল্য হ্রাস করার প্রস্তাব করেন, আশুতোষ তার ঘোরতর বিরোধিতা করে বলেছিলেন: "সরকার এতদিন বলে এসেছেন যেসব ছাত্র পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করবে, তাদের যদি অর্থ সঙ্গতির অভাব থাকে—তাহলে উচ্চশিক্ষার সুযোগ দেবার জন্য সরকার তাদের জন্য বৃত্তি বরাদ্দ করবেন। বর্তমান প্রস্তাব সরকারের সেই পূর্বস্বীকৃত প্রস্তাবের পরিপন্থী।"

১৯০২ সালে আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের আঞ্চলিক সদস্যরূপে নিযুক্ত হন। কমিশনের কাজ করতে গিয়ে তিনি বুঝতে পারেন কেন্দ্রীয় সরকার অদূর-ভবিষ্যতে একটি য়ুনিভারসিটি আইন পাশ করবেন—যার লক্ষ্য হবে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের অযথা হস্তক্ষেপের স্বাধীনতা। এই সম্ভাবনা রদ করার জন্য তিনি ইম্পিরিয়েল কাউন্সিল-এর সদস্য হতে চেয়েছিলেন।

বাংলা প্রাদেশিক কাউন্সিল-এর বেসরকারী সদস্যেরা ১৯০৩ সালে তাঁকে তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে ইম্পিরিয়েল কাউন্সিলে পাঠান।

১৯০৪ সালে য়ুনিভারসিটি আইনের প্রবল বিরোধিতা করে তিনি প্রমাণ করেছিলেন তাঁকে প্রতিনিধি নির্বাচন করা যুক্তিযুক্ত হয়েছিল।

এই বিরোধিতার ব্যাপারে তাঁর প্রধান সহায় হয়েছিলেন গোপালকৃষ্ণ গোখলে। তাঁদের মিলিত চেষ্টায় ফলে য়ুনিভারসিটি আইন আবার ঢেলে সাজাতে হয়েছিল।

ভাইসরয় লর্ড কার্জন-এর নিম্নলিখিত উক্তি থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হবে ইম্পিরিয়েল কাউন্‌সিল-এর সদস্যরূপে আশুতোষের কতখানি কৃতিত্ব: "এই সেদিন মাত্র মাননীয় সদস্য মহোদয় এই কাউন্‌সিল-এ নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। তাঁর নির্বাচনের খবরটুকু পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আমরা এই বিল-এর সিলেক্ট কমিটিতে যুক্ত করি। তিনি কমিটিতে এলে বিল-সংক্রান্ত আলোচনা দীর্ঘায়িত ও বিতর্কমূলক হতে পারে, সেকথা জেনে-শুনেও তাঁর সহায়তা গ্রহণে আমরা একটুও ইতস্তত করিনি মূলতঃ এই কারণে যে যোগ্য ব্যক্তির যুক্তিগ্রাহ্য বিচার ও সমালোচনাকে আমরা পুরোপুরি সুযোগ দিতে চাই। সুবিধাবাদী চাটুকারদের আমরা চাই না।"

য়ুনিভারসিটি আইনের ১২ নম্বর উপধারায় যেসব সাময়িক বিধি-ব্যবস্থার অবতারণা করা হয়েছে, তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে কার্জন বলেন: "এই সব বিধিব্যবস্থার মূলে রয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট-এর জনৈক প্রাজ্ঞ বিচারক মহোদয়ের উদ্ভাবনী দক্ষতা। এক বছর আগে তিনি এই কাউন্‌সিল-এর সদস্য হয়ে এই বিল-এর সিলেক্ট কমিটিতে যুক্ত হন। সেখানে তিনি মিঃ গোখলের মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং বর্তমানে যে আকারে বিলটি আপনাদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে সে তাঁদের মিলিত চেষ্টার ফল।"

ইম্পিরিয়েল কাউন্‌সিল-এ সদস্য থাকাকালে তিনি অপর একটি গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয়ে মনোনিবেশ করেছিলেন—সে হল ভারতে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী রাখার ব্যয়বরাদ্দ। এই ব্যয়বরাদ্দের একটা ভাগ বহন করত ব্রিটিশ

সরকার, অন্য ভাগ ভারত সরকার। ভারত সরকারের খাতে ব্যয়বরাদ্দ বেশি করে চাপানোর বিরুদ্ধে তিনি ঘোরতর আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন: "গোড়ায় ভারতের খাতে ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছিল বছরে দু লক্ষ বিশ হাজার পাউণ্ড। ব্রিটিশ সরকার ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর মাহিনা বৃদ্ধি করার ফলে বাৎসরিক ব্যয়বরাদ্দ শেষ পর্যন্ত যদি সাত লক্ষ ছিয়াশি হাজার পাউণ্ডে দাঁড়ায়—তাহলে সেই বাড়তি টাকাটা ভারতের রাজস্ব থেকে আদায় দেওয়া কি যুক্তিসঙ্গত হয়?"

বাংলার প্রাদেশিক বিধান সভায় তিনি যতটা সক্রিয় ছিলেন, কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানে ততটা সক্রিয় তিনি হয়তো ছিলেন না। কিন্তু সেখানকার কোনো অধিবেশনে উপস্থিত থাকলেই তিনি করদাতাদের সপক্ষে দাঁড়াতেন। মেরামতি ও পয়ঃপ্রণালী নির্মাণের জন্য অনির্দিষ্টকাল রাস্তাঘাট বন্ধ রাখার বিরুদ্ধে তিনি কঠোরভাবে বলেছেন। পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ করতে গিয়ে শহরের ঘরবাড়ির ভিত্তি জখম হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন। এমনি আরো অনেক ঘটনা থেকে বুঝা যায় শহরের সাধারণ বাসিন্দাদের সুখদুঃখ নিয়ে তাঁর কতখানি চিন্তা ও উদ্বেগ ছিল।

নবম অধ্যায়

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে দেশকে আশুতোষ যা দিয়ে গেছেন, তাহল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সত্যকার আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়রূপে দাঁড় করানো। তা করতে গিয়ে তিনি ভারতের অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে এমন একটি আদর্শ স্থাপন করেছিলেন যাকে বলা যেতে পারে ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় কেমন রূপ নেবে—সেই বিষয়ে তাঁর ধ্যানধারণা।

তাঁর এই আদর্শবাদী দৃষ্টিতে তিনি দেখেছিলেন পঠন-পাঠনের সঙ্গে গবেষণাকে যদি যুক্ত করা না হয়, তাহলে যমুনা-গঙ্গার মিলিত ধারার একটি বিদ্যাতীর্থ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হবে না। বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার অচলায়তন ধূলিসাৎ করে দিয়ে, তিনি সে জায়গায় একটি মুক্তবন্ধ বিশ্ববিদ্যাতীর্থ রচনার কাজে নিজের জীবনকে যেন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।

জর্মন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যে রীতিতে কাজ করে, সে রীতি আশুতোষের খুবই মনে ধরেছিল। জর্মন প্রথায় সুযোগ্য অধ্যাপক তিনি—যিনি দিতে জানেন আবার নিতেও জানেন; যিনি দৈনন্দিন পঠন-পাঠনের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকেন না; পাঠ্যবস্তু নিয়ে নিয়ত আলোচনা গবেষণার মধ্যে দিয়ে যিনি বিদ্যার পরিধি প্রসারিত করতে থাকেন। কেবল চর্বিতচর্বণ নয়, গবেষণার সাহায্যে নিত্য নূতন জ্ঞানের বস্তু আহরণ করে শিক্ষার বিস্তার—এ কেবল জার্মেনী নয়, অন্য পাঁচটা পাশ্চাত্ত্য দেশেরও উচ্চশিক্ষার আদর্শ ছিল শিক্ষার প্রগতি।

পরে যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকল্পবচন হয় 'শিক্ষার প্রগতি'—এইভাবেই তার উদ্ভব হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য লর্ড লীটন-এর কাছে শিক্ষার আদর্শ ছিল কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। তাঁর মতে, "বিশ্ববিদ্যালয় এক ধরনের মানুষ তৈরি করার বিরাট কারখানা। আমি চাই বিশ্ববিদ্যালয় যেন চাহিদা মোতাবেক মাল যোগান দিতে পারে।" আসলে সরকারী মহলের মনের কথাটুকুই তিনি রূঢ় ভাষায় এইভাবে প্রকাশ করেছিলেন এবং এর যে কারণটি কি, সেকথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

এই সংকীর্ণ মনোবৃত্তির প্রতিবাদে আশুতোষ ১৯২২ সালে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে কী বলেছিলেন সেটি অনুধাবন করলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার আদর্শ বিষয়ে তাঁর ধারণা স্পষ্টতর হবে। তিনি বলেছিলেন, "আমার ধারণায় বিশ্ববিদ্যালয় হবে জ্ঞানের বিরাট ভাণ্ডার, শিক্ষার মান নির্দিষ্ট করা মহান প্রতিষ্ঠান, জ্ঞানের বিপুল কর্মশালা এবং কর্ম-জগতে ও জ্ঞানের জগতে যাঁরা নেতৃস্থানীয় হবেন—তাঁদের অনুশীলনের প্রশস্ত ক্ষেত্র। বিদ্যার সংরক্ষণ, নূতন নূতন বিদ্যার আবিষ্কার, কর্মক্ষেত্রে বিদ্যার প্রয়োগ এবং সর্বোপরি বিদ্বৎসমাজ সৃষ্টি করার কাজে বিশ্ববিদ্যালয় হবে রাষ্ট্রের সহায়ক প্রতিষ্ঠান।"

লর্ড লীটন যে বিশ্ববিদ্যালয়কে নিশ্চল নির্জীব প্রতিষ্ঠানরূপে কল্পনা করেছিলেন তার নিহিত কারণ ছিল এই যে, সূচনায় কথা ছিল লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে কেবল পরীক্ষা গ্রহণের কেন্দ্ররূপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দাঁড় করানো হবে।

কাজে কাজেই য়ুরোপের অন্য আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপান্তর না হওয়া পর্যন্ত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সাধন ছিল সুদূর পরাহত। সৌভাগ্যের বিষয় বর্তমান শতকের প্রারম্ভে রক্ষণশীল লণ্ডনেও পরিবর্তনের ঢেউ এসে লেগেছিল। সেখানকার কর্মসূচী কেবল পরীক্ষা গ্রহণে আবদ্ধ থাকবে না, শিক্ষণ ও গবেষণাকেও

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কৃত্যরূপে স্বীকার করতে হবে—এই ধারণা সেখানেও শিকড় গেড়েছিল।

লণ্ডনের পটভূমি যখন এইরকম, সেই সময়েই আশুতোষ ইম্পিরিয়েল কাউন্সিল-এর সিলেক্ট কমিটির সদস্য থাকায়, ১৯০৪ সালের য়ুনিভারসিটি আইনে পরীক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পঠন-পাঠনেরও ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে পারে বলে স্বীকৃত হয়। এর ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী।

গোড়াতে এই নূতন প্রস্তাব সম্বন্ধে গোপালকৃষ্ণ গোখলে বেশ একটু দ্বিধান্বিত ছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল সরকার যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যথাপ্রয়োজন অর্থসাহায্য বরাদ্দ না করেন, তাহলে নূতন ব্যবস্থা বানচাল হতে বাধ্য। আশুতোষ বুঝেছিলেন প্রস্তাবটা একবার যদি সরকারকে দিয়ে গ্রহণ করানো যায়, তাহলে বেদুইনের তাঁবুতে শীতার্ত উটের নাক-গলানোর মতো ব্যাপার হবে। পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে দেখা যায় তাঁর এই অনুমান মিথ্যা হয়নি।

১৯১৩ সালে আশুতোষ বলেছিলেন, “আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা বেড়েছে, পঠন-পাঠনের মানও বেড়েছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন থেকে যতখানি ফলোদয় হয়ে থাকে, আমাদের দেশে তেমনটা এখনো হয়নি অর্থাৎ আমাদের ব্যবস্থা এখনো পূর্ণবর্ধিত হয়ে উঠেনি। জ্ঞানের উন্নতি ও সম্প্রসারণের দিক থেকে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দান এখনো অকিঞ্চিৎকর। জ্ঞানের দীপ-বর্তিকা যেন নিভে না যায় সেজন্য আমরা প্রহরা দিচ্ছি সত্য, কিন্তু তাকে আরো দীপ্তিমান করে তুলে ধরতে এখনো আমরা পারিনি।”

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা আদৌ ফলপ্রসূ হবে কিনা সে বিষয়ে লর্ড কার্জন সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। ভারতের বিদ্বৎসমাজকে সে যেন একপ্রকার দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করার মতো হয়েছিল। ভারতীয়েরা পশ্চাৎপদ হয়নি ; আশুতোষ দেশবাসীর কাছে আবেদন করে প্রায় পঞ্চাশ

লক্ষ টাকা অল্পকালের মধ্যে সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। এ টাকার মোটা অংশ এসেছিল কলকাতা হাইকোর্টের তুজন প্রখ্যাত ব্যবহারজীবীর কাছ থেকে—তাঁরা হলেন স্যর তারকনাথ পালিত ও স্যর রাসবিহারী ঘোষ।

স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠন কলকাতায় পূর্ব থেকেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু তাঁর সমধিক উন্নতির সূত্রপাত হয় ১৯১৭ সাল থেকে।

রীডারশিপ-এর ব্যবস্থাও ছিল পূর্ব থেকে—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি রীডার হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়েও গিয়েছিলেন। এবার স্থির হল বিষয় অনুসারে বিভিন্ন স্নাতকোত্তর বিভাগে স্থায়ী চেয়ার কিংবা প্রফেসরশিপ প্রতিষ্ঠা করে, বিশিষ্ট ভারতীয় পণ্ডিতদের সেইসব আসনে বসাতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন সম্প্রসারণকল্পে একটি বড় পদক্ষেপ হল ১৯০৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজ প্রতিষ্ঠা। কলেজের সংলগ্ন বিশাল গ্রন্থাগার এই নূতন প্রতিষ্ঠানের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করল।

আশুতোষ বলতেন, "আইনকে পেশা জ্ঞান করা ভুল, তেমনি ভুল আইনকে ফাঁকা বুলির জাতু বলে ভাবা। আইন বাস্তবপক্ষে ব্যবহারিক বিজ্ঞান।" বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজে পঠন-পাঠন ও গবেষণার ধরন নির্ধারিত হয় আশুতোষের এই সারগর্ভ উক্তি থেকে।

প্রখ্যাত আইনজীবী হিসাবে এই আইন কলেজের প্রতি আশুতোষের একটু যেন বিশেষ মমতা ছিল। তিনি চাইতেন কলকাতার এই কলেজ যেন হারভার্ড ল স্কুলের ধাঁচে গড়ে উঠে।

ল কলেজ থেকে কেবল যে ভালো ভালো নামকরা উকিল বেরিয়েছেন এমন নয়—আইনের এমন বহু অধ্যাপকও বেরিয়েছেন যাঁদের খ্যাতি দেশজোড়া। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় ভারতের প্রথম প্রেসিডেন্ট রাজেন্দ্র-প্রসাদ এককালে এই কলেজেই অধ্যাপনা করেছেন। পরবর্তীকালে

ভারতের প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় ও সুধীরঞ্জন দাস—এঁরাও ল কলেজে এককালে অধ্যাপক ছিলেন।

এখানকার পঠন-পাঠন নিয়ে আশুতোষের আগ্রহের অন্ত ছিল না। আইনের ছাত্রেরা যখন মুট কোর্ট-এ কল্পিত মোকদ্দমা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক ও আলাপ-আলোচনা করত, তিনি স্বয়ং অনেক সময় তাঁদের মধ্যে বসে এইসব বিতর্ক ও আলোচনায় যোগ দিতেন।

মূলতঃ তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী ঘোষের বদান্যতার ফলে ১৯১২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অব সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজির পত্তন হয়। কলেজের প্রতিষ্ঠাদিবসে আশুতোষ বলেছিলেন, "এই কলেজের ছ জন প্রফেসরের মধ্যে তিন জনই অবাঙালী। এই নিয়ে যদি আমি সন্তোষ প্রকাশ করি, আশা করি কেউ সেটাকে অশোভন বলবেন না। আমাদের শিক্ষকবর্গের মধ্যে তিনজন যে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও উত্তর প্রদেশের প্রখ্যাত সন্তান—এ নিয়ে আমি গর্ব অনুভব করি। বিজ্ঞান যে সর্বজনীন—এই ঘটনা হল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমি সর্বান্তঃকরণে আশা করি যে যদিচ এই কলেজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অবিচ্ছেদ্য অংশবিশেষ তবু কেউ যেন মনে না করেন যে এটি নিতান্তই প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান। এই কলেজ যেন সর্বভারতীয় বিজ্ঞান কলেজ হয়। ভারত সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা এখানকার পঠন-পাঠনের উচ্চমান ও গবেষণার সুযোগ-সুবিধায় আকৃষ্ট হয়ে, যেন দলে দলে এখানে এসে জড়ো হন।"

এই সুবাদেই তাঁর খ্যাতি বহু বিস্তৃত হবার বহু আগে, ভারত সরকারের ফিনান্স বিভাগের জনৈক অফিসর, সি. ভি. রামন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের ফিজিক্স-এর পালিত প্রফেসর হয়ে যোগ দেন।

১৯১৭ সালে কলকাতায় যে সায়েন্স-কন্‌ভেনশন হয়, তার ফিজিক্স বিভাগের গণিত শাখার সভাপতি হিসাবে রামন যা বলেছিলেন, পাঠকের আগ্রহ উদ্রেক করবে মনে করে তাঁর সেই বক্তৃতার অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি :

"কলকাতা বিশ্ববিত্থালয়ে নূতন নিয়মাবলী চালু করা হয় ১৯০৯ সালে। পরবর্তী যুগের প্রগতির মূলে ছিল এই সংস্কার সাধন। এর ফলে গণিত শিক্ষাকে জোরদার করা হয়। ল্যাবরেটরিতে হাতে-কলমে যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করার উপর জোর দেবার ফলে ফিজিক্স পঠনীয় বিষয় হিসাবে বেশ শক্ত হয়ে উঠে।

"ডক্টর এ. শুস্টার ও ডক্টর জি. টি. ওয়াকারকে রীডারশিপ বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। দেশের লোকও বিজ্ঞানে কৃতিত্ব দেখাবার জন্য সুযোগ-সুবিধা লাভ করেন। আলোক বিজ্ঞান সংক্রান্ত নিয়মের ব্যাখ্যা নিয়ে ডক্টর ডি. এন. মল্লিক যে বক্তৃতাগুলি দেন, সেগুলি একত্রিত করে কেমব্রিজ য়ুনিভারসিটি প্রেস গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন। 'নেচার' পত্রিকায় তার সমালোচনাও বেরিয়েছে।"

"কিন্তু বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য যে দাতারা অর্থানুকুল্য করেছিলেন তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ বা ত্বরান্বিত হবার পথে নানা ঘটনার সমবায়ে প্রতিবন্ধক দেখা দেয়। এই বিলম্বের জন্য মুখ্যত দায়ী হল সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্য বরাদ্দ যথাসময়ে না পাওয়া। একটি প্রথম শ্রেণীর ফিজিক্স ল্যাবরেটরি গড়ে তোলা ও যন্ত্রপাতি সরঞ্জাম দিয়ে সাজানো খুবই ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। সুতরাং সরকারের সাহায্যটুকু যথাসময়ে পাবার খুবই প্রয়োজন ছিল। আরো যেসব কারণে দেরী হল, তার একটি হল পালিত এস্টেট নিয়ে মামলা যার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নির্দিষ্ট দানের স্থায়িত্ব নির্ধারণ করা যাচ্ছিল না, অন্যটি হল ভারত সরকারের এডুকেশন মেম্বর স্যর হারকোর্ট বাটলার-এর আচরণ। নানা অনিশ্চয়তার প্রসঙ্গ থাকা সত্ত্বেও, স্যর হারকোর্ট গোঁ ধরে বসলেন আমার স্থায়ী সরকারী চাকুরীতে ইস্তফা না দেওয়া পর্যন্ত আমায় পালিত চেয়ার গ্রহণ করতে দেবেন না। এইসব কারণে ১৯১৭ সালের জুলাই মাসের আগে আমার পক্ষে বিশ্ববিত্থালয়ের কাজে যোগদান করা সম্ভবপর হয়নি।…"

এখন বলা যেতে পারে যে কলকাতায় মৌলিক গবেষণার কেন্দ্র দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমার এই উক্তির সমর্থনে গত তিন বছরের কাজ থেকে নির্বাচিত পঁচিশটি পেপারের ইতিহাস আমি আপনাদের কাছে উপস্থিত করছি।

অপর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল প্রথমত বি. এ. পরীক্ষার পাঠ্য-বিষয়রূপে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যকে (বিশেষত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য) স্বীকৃতি দান এবং তার কিছুদিন পরে স্নাতকোত্তর পরীক্ষাতেও তাদের অন্তর্ভুক্তি।

১৯১৩ সালের ২৬ ডিসেম্বর তারিখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সাহিত্যে দেশিকোত্তম (ডি. লিট) উপাধি দান করেন। বাংলা সাহিত্যকে তিনি নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন, সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ লাভ করে পৃথিবীর চোখে দেশের সম্মানবৃদ্ধি করেছেন—সেই সুবাদে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এই সম্মাননা। সেই বিশেষ সমাবর্তন অধিবেশনে আশুতোষ বলেছিলেন: "শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের জাতীয় কবি। আমাদের গর্ব ও আনন্দের কথা এই যে আজ তিনি কেবল বাংলা সাহিত্যের শীর্ষ স্থানে আসীন নন, আজ তাঁর আসন পাতা হয়েছে সমস্ত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবিদের পুরোভাগে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিখ্যাতি ছাড়াও আরো একটি বিশেষ তাৎপর্যের বিষয় এই যে, এমন একজন লেখক যিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ সকল রচনা লিখেছেন তাঁর মাতৃভাষায় অর্থাৎ একটি ভারতীয় ভাষায়, তিনি আজ বিশ্ববরেণ্য হলেন। এই মহৎ ঘটনার কিছুকাল পূর্বেই আরো একটি বিপ্লবাত্মক ঘটনা ঘটে গেছে শিক্ষার ক্ষেত্রে। ভারতীয় ভাষা আজ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যতম পঠনীয় বিষয় বলে স্বীকৃত। আজ থেকে প্রায় তেইশ বছর আগে এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই সেনেট-এর একজন তরুণ ও অনভিজ্ঞ সদস্য একটি সনির্বন্ধ অনুরোধ পেশ করে প্রস্তাব করে-ছিলেন যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক উপাধি পেতে হলে ভারতীয় ভাষায়

যথোচিত ব্যুৎপত্তির প্রমাণ দিতে হবে। সেনেট-এর বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যেরা তরুণ বাগ্মীর বাকপটুতা ও দুঃসাহসের প্রশংসা করেছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর সেই প্রস্তাব গ্রহণ করা বিজ্ঞজনোচিত হবে বলে মনে করেন নি। ভোট দেবার সময় গরিষ্ঠ সংখ্যক সদস্য সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার স্বপক্ষে একটি আশ্চর্য যুক্তি উপস্থিত করেছিলেন: তাঁরা বলেছিলেন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্রদের ভারতীয় ভাষা নিয়ে চর্চা করার অর্থ অযথা সময়ের অপচয় কারণ ভারতীয় ভাষায় এমন কিছু নেই যা স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রদের পঠন-পাঠনের যোগ্য। এই ঘটনার পনরো বছর পরে, সেই তরুণ সেনেটর তাঁর নিজের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানবৃদ্ধি হয়েছে মনে করে, পুনরায় একই প্রস্তাব উত্থাপন করে একই ভাবে ব্যাহত ও বিফল হয়েছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে পরের বছরে তিনি লর্ড মিণ্টোর সরকারকে তাঁর সেই প্রস্তাবের অনুকূলে আনতে পেরেছিলেন। সেই বছর থেকে স্থির হয় স্নাতকপূর্ব স্তরের প্রত্যেকটি ছাত্রকে তার মাতৃভাষায় যথোচিত ব্যুৎপত্তি লাভ করতে হবে, মাতৃভাষায় তার কুশলতা যাচাই করতে হবে অন্যান্য পঠনীয় বিষয়ের মতোই, অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হতে হলে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাকে মাতৃভাষাতেও নির্দিষ্ট সংখ্যক নম্বর পেতে হবে। দীর্ঘ পঁচিশ বছর আন্দোলন করার পর এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যটুকু স্বীকৃত হয় যে, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে যদি আমাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত অঙ্গীভূত করতে হয়, তাহলে ভারতীয় ভাষাগুলিকে স্বীকৃতি দানের দুর্নিবার দাবী না মেনে নিলে চলবে না। মাতৃভাষাকে সম্মাননার নীতি গৃহীত হবার সঙ্গে সঙ্গে সুফল যে ফলেনি এমন নয়, তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে এই মৌলিক পরিবর্তনের মঙ্গলকর প্রভাব কত যে সুদূর প্রসারী, কালে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মিলবে। আপাতত তেইশ বছর পূর্বেকার সেই তরুণ সেনেটর আজ তাঁর পদাধিকার বলে মহামহিম চ্যান্সেলর মহোদয়কে অনুরোধ জানাচ্ছে তিনি যেন সাহিত্যে দেশিকোত্তম উপাধি প্রদান করে

বাংলার এই প্রখ্যাত সন্তানের গৌরবকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।”

১৯৬৪ সালে, ভারতের রাষ্ট্রপতি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব দর্শনের অধ্যাপক, ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ কলকাতায় আশুতোষ ইনষ্টিট্যুট অব ল্যাংগুয়েজ উদ্বোধন করতে গিয়ে আশুতোষের সুদূরদর্শিতার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছিলেন যে সকল ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. ডিগ্রি প্রবর্তন করে আশুতোষ মস্ত একটি কাজ করে গেছেন। তার চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হল এই যে তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন বাংলায় এম. এ. ডিগ্রি নিতে হলে বাংলা ছাড়া আর যে কোনো একটি ভারতীয় ভাষা বা সাহিত্যের বিষয়ে—তা সে হিন্দি, মারাঠি, গুজরাতী, তামিল, তেলুগু, ওড়িয়া, অসমীয়া, উর্দু বা অন্য যে কোনো ভাষা হোক—জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এই রকম ব্যবস্থার ফল সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। রাধাকৃষ্ণণ আরো বলেছিলেন, “আমরা অনেক ঠেকে যা শিখেছি, তিনি তাঁর সহজ প্রতিভায় অনেক আগেই তা বুঝেছিলেন।”

তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী ঘোষের বিশেষ অনুদান, সরকারী অর্থ সাহায্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দ করে, বিভিন্ন বিষয়ে স্থায়ী অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করা হল। এইভাবে আশুতোষের স্বপ্ন আংশিকভাবে সত্য হল, বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে কতকগুলি স্নাতকোত্তর বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে।

১৯০৬ সালে আশুতোষ যখন প্রথম উপাচার্য হন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর পদ ছিল মাত্র একটি, ১৯২৪ সালে তিনি যখন ইহলোক ত্যাগ করে যান তখন একটির জায়গায় পঁচিশটি অধ্যাপক পদ পত্তন করা হয়। উপরন্তু কলা ও বিজ্ঞান বিভাগ মিলিয়ে লেকচারার পদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল এক শোর কাছাকাছি।

১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর লর্ড রোণাল্ডশে তাঁর সমাবর্তন

ভাষণে বলেছিলেন : "ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রদ্ধার যে অর্ঘ্য নিবেদনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয়েছে, তা নিয়ে আপনারা সকলেই গর্ব ও আনন্দ অনুভব করতে পারেন। স্নাতকোত্তর সংস্কৃত বিভাগে ভারতীয় জ্ঞানের সমৃদ্ধ সম্ভার নিয়ে সুযোগ্য পণ্ডিতেরা পঠন-পাঠন ও গবেষণায় রত আছেন, পালি বিভাগে বৌদ্ধ শাস্ত্রাদির অনুশীলন চলেছে, ঐস্‌লামিক বিভাগে ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন, ব্যাকরণ নিয়ে চর্চা হচ্ছে। বিজ্ঞানের অধ্যাপনা গবেষণার পাশাপাশি ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যে অধ্যয়ন অধ্যাপনা শুরু হয়েছে। সম্প্রতি ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য এই নূতন বিভাগটি খোলা হয়েছে সুপরিকল্পিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। যাঁরা এদেশের মানুষ, দেশকে যাঁরা ভালোবাসেন, তাঁদের প্রত্যেকে নিশ্চয় ভারতীয় জ্ঞানের সম্প্রসারণ কল্পে এই বিরাট উদ্‌যোগের জন্য কৃতার্থ বোধ করবেন ও এর আনুকূল্য করবেন। এসব কাজের জন্য যিনি দায়ী, যিনি আপনাদের সকলের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পাত্র তিনি আর কেউ নন, এই দেশেরই সুযোগ্য সন্তান—স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।"

দশম অধ্যায়

সরকারের সঙ্গে বিরোধ

আশুতোষের ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্ভ্রমবোধ এমনি বিশিষ্ট ছিল যে রাজশক্তির সঙ্গে নির্বিরোধে তিনি দীর্ঘকাল ধরে কাজ করতে পেরেছিলেন—সেটাই আশ্চর্য। সরকারের সর্বোচ্চ পদে যাঁরা ছিলেন তাঁদের সঙ্গে তাঁর ততটা মনান্তর হত না—খিটিমিটি বাধাত চুনোপুঁটির দল।

বিরুদ্ধ দলের নায়ক যিনি হলেন, তাঁর নাম হেনরি শার্প। নেটিবদের কী করে শায়েস্তা করতে হয় শার্প তার তালিম পেয়েছিলো কার্জনী আমলে পূর্ববঙ্গ ও আসামের লেফটন্যান্ট গবর্নর কুখ্যাত ব্যামফিল্ড ফুলার-এর কাছ থেকে। এই লোকটির কেমন যেন কলকাতার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রতি একটা জাতক্রোধ ছিল, কী করে তাঁদের দাবিয়ে রাখা যায় তাই ছিল যেন তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।

ব্যামফিল্ড ফুলার-এর সাগরেদ হেনরি শার্প পূর্ববঙ্গ ও আসামের ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকশন পদে যখন ছিলেন, সেই সময় থেকে বাঙালী বিদ্বেষ তাঁর মনে শিকড় গজায়। দিল্লীর শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারি হয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গে শার্প আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে খোঁচা মারার অছিলা খুঁজতে লাগলেন। তিনি তখন বুঝতে পারেন নি কীরকম শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার স্পর্ধায় তিনি মেতেছিলেন।

গোলমালের সূত্রপাত হয় আবদুল রসুল ও কাশীপ্রসাদ জয়সোয়ালের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিয়োগ করা নিয়ে।

১৯১৫ সালে এ বিষয়ে একটি নোটে হেনরি শার্প লিখেছিলেন : "আচ্ছা, এই রসুল কি আমাদের সেই পূর্বপরিচিত কংগ্রেসওয়ালা? সেটাই যদি

তাঁর প্রধান গুণ বলে মনে করা হয়, এম. এ. পড়াবার জন্য, তাহলে বলব এ তো নেহাৎই কাঁচা রকমের প্রস্তাব। ভাইস চ্যান্সেলর এমন করেন যেন এসব ব্যাপার পূর্ব থেকে স্থির হয়ে গেছে। চ্যান্সেলর-এর অনুমোদনের জন্য তিনি অপেক্ষা রাখেন না। য়ুরোপীয় প্রফেসরদের যেভাবে কোণঠাসা করে তিনি রেখেছেন, তা থেকেই তাঁর মনমেজাজ বুঝতে পারা যায়।

"শুনেছি এ রসুল অপর কেউ নয়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্ররোচনায় যিনি বিক্ষোভের সৃষ্টি করেন—সেই আবদুল রসুল। কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল লোকটিও সুবিধার নয়, বিলেতে থাকতে এঁর সঙ্গে বিপিনচন্দ্র পাল ও বিনায়ক দামোদর সাভারকরের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। সম্প্রতি ইনি নাকি ইজিপ্ট গিয়ে সেখানকার জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে দহরমমহরম করেএসেছেন। এইসব লোকেরা কীরকম ইতিহাস পড়াবে—সে তো বুঝাই যাচ্ছে।"

কেবল শার্প কেন, আরো কেউ কেউ এই ধরনের নোট লিখে পাঠিয়েছিলেন ভাইসরয়-এর কাউন্সিলে শিক্ষা সদস্য স্যর হারকোর্ট বাটলার-এর কাছে। বাটলার নিজে ধরা ছোঁওয়া না দিলেও, ভিতরে ভিতরে অধীনস্থ কর্মচারীদের এরকম আচরণ সমর্থন করতেন।

ভারত সরকার—রসুল, সুরাওয়ার্দি ও জয়সোয়ালের নিয়োগ বাতিল করে দেন।

আশুতোষ শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারিকে সে সময় লিখেছিলেন: "রসুল হচ্ছেন একমাত্র লোক যাঁকে আন্তর্জাতিক আইন পড়াবার জন্য পাওয়া যেতে পারে। অক্সফোর্ড-এ বি. সি. এল. ডিগ্রির জন্য পড়তে গিয়ে তিনি আন্তর্জাতিক আইনকে তাঁর বিশেষ বিষয়রূপে বেছে নিয়েছিলেন। পাশ্চাত্ত্য দেশে আরবের ভাষা ও সাহিত্য যেমনভাবে পড়ানো হয়ে থাকে, সুরাওয়ার্দি ঠিক তেমনভাবে পড়াবার যোগ্যতা রাখেন। ভারতের প্রাচীন যুগের ইতিহাস বিশেষত বৌদ্ধযুগের ইতিহাস জয়সোয়াল যেমন পড়াতে পারবেন—তেমন খুব কম লোকই পারবে।"

ভারত সরকার "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অদ্ভুত অকৃতজ্ঞতা" ও "স্যর আশুতোষের দুঃসহ স্পর্ধা"—বিষয়ে যখন কানাঘুষো করছেন, শার্প একটা চেষ্টা করেছিলেন যাতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের কাছ থেকে কোনোরকম অর্থসাহায্য না পায়।

শার্প-লিখিত একটি নোটে প্রস্তাব ছিল, "যতদিন না কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রুটি দূর করা না হয় ততদিন সরকারী সাহায্য মুলতবী থাকুক।"

১৯১৫ সালের মাঝামাঝি স্যর শংকরন নায়ার ভাইসরয়ের কাউন্সিল-এর শিক্ষা সদস্য হলেন। তার আগে পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও আশুতোষের বিরুদ্ধে দিল্লীতে একটা চক্রান্ত চলেছিল।

১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সরকারের আওতায় আসে এবং বাংলার লাট লর্ড রোণাল্ডশে পদাধিকার বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হন। আশুতোষকে তিনি কী প্রকার শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন, সে বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বে বলেছি। কিন্তু তাঁর কার্যকালের শেষে লর্ড লীটন যখন বাংলার লাট হয়ে এলেন তখন আর এক দফা পটপরিবর্তন হল।

আশুতোষকে লেখা লীটন-এর কুখ্যাত পত্র ও আশুতোষের প্রত্যুত্তর—এই দুটি থেকেই অংশবিশেষ তুলে দিলে পর বুঝতে পারা যাবে আশুতোষের ব্যক্তিত্ব কেমন ছিল এবং শিক্ষাব্রতীরূপে তিনি কীভাবে তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধার কথা বিন্দুমাত্র না ভেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে সরকারের অযথা হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন।

১৯২৩ সালের ২৪ মার্চ তারিখে লীটন আশুতোষকে লিখলেন: "গত কয়েক মাস ধরে আপনি যেভাবে চলেছেন তারপর আপনাকে পুনরায় নিয়োগ করার কথা ভাবাই চলে না। এ পর্যন্ত আপনার কাছ থেকে কোনো সহায়তা তো আমরা পাইইনি, বরঞ্চ সুবিধা পেলেই আপনি আমাদের প্রতিকূলতা করেছেন। আপনি যেসব মন্তব্যাদি করেছেন তা রচনাত্মক নয় বিনাশাত্মক। আমাদের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য যাতে লোকে ভুল

বুঝে, সেইদিকে নজর দিয়েছেন। আমাদের বিল-এর দোষত্রুটি কীভাবে সংশোধন করা যায় সে বিষয়ে কোনো সহায়ক বুদ্ধিপরামর্শ আপনি আমাকে আপনার মিত্র ও চ্যান্সেলর জ্ঞানে দিতে আসেন নি। বরঞ্চ সরকারকে লোকচক্ষুতে খাটো করার উদ্দেশ্যে কাগজে পত্রিকায় প্রতিবাদ প্রবন্ধাদি লিখিয়ে প্রকাশ করিয়েছেন। স্যর মাইকেল স্যাড্‌লার, ভারত সরকার ও আসাম সরকারকে পত্রযোগে আপনি অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁরা সকলে যেন বিল-এর বিরোধিতা করেন। সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সহযোগ বৃদ্ধির প্রয়াসী কোনো সহকর্মী এই ধরনের কাজ নিশ্চয় করতেন না, কারণ এ কাজ হল এই দুয়ের মধ্যে সকল সম্পর্ক ভেঙ্গে দেবার মতো কাজ। আপনি যদি সরাসরি ও খোলাখুলিভাবে বিরোধিতা করে আমায় বলতেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের মঙ্গলের কথা ভেবে, অনন্যোপায় হয়ে আপনার নীতির বিরোধিতা আমায় করতে হচ্ছে, আপনার সঙ্গে আমি সহযোগ করতে পারছি না," তাহলে আমি এভাবে অনুযোগ করতাম না। তাই যদি আপনার সত্যকার মনোভাব হয়, তাহলে আপনি নিশ্চয় আশা করতে পারেন না যে সরকার আপনাকে সহকর্মীরূপে রাখবে ও আপনাকে পুনরায় ভাইস চ্যান্সেলর হতে বলবে।

"নূতন করে ভাইস চ্যান্সেলর বহাল করার সময় আগত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেও এখন অনেক কিছু নূতন করে ঢেলে সাজাবার সময় এসেছে। এই অবসরে আপনার কাছ থেকে এমন একটা নিশ্চিতি আমি পেতে চাই যে বিরোধিতার মনোভাব ত্যাগ করে আপনি এখন আমার সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা পরিহার না করে সরকারী তহবিল থেকে অর্থসাহায্য লাভের একমাত্র উপায় হল এই সহযোগিতা। এ যদি আপনি করতে পারেন তাহলে আপনি আমার সহকর্মীরূপে থাকতে পারেন, স্বমতে যদি সবাইকে আনতে পারার ক্ষমতা থাকে তো আপনি এই বিল-এর যেসব দোষত্রুটি আছে তার নিরাকরণ

করতে পারেন। কিন্তু আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে আপনি সরকারের বিরোধিতা করবেন না, সরকার কর্তৃক আনীত বিল-এর বিপক্ষতা করার জন্য আর কাউকে প্ররোচিত করবেন না। তা যদি আপনি করতে পারেন, তাহলে আপনাকে পুনর্নিয়োগের ব্যাপারে আমার মন্ত্রীর অনুমোদন আমি চাইতে পারি। যদি সর্বান্তঃকরণে এ কাজ করা আপনার পক্ষে সম্ভবপর না হয়, তাহলে আপনি ভাইস চ্যান্সেলর পদ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে স্বাধীনভাবে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেন।”

এই চিঠির জবাবে আশুতোষ লেখেন:

“আপনি অনুযোগ করেছেন এ পর্যন্ত আমি আপনাকে কোনোভাবে সহায়তা করিনি। এর জবাবে আমি বলতে চাই সদাসর্বদা আমার সাহায্য ও উপদেশ আপনাকে আমি দিয়ে এসেছি। সে আপনি কেন যে গ্রহণ করেন নি, তা কেবল আপনিই জানেন।

“আপনার পুনরায় বলতে বাধেনি যে আমি সরকারকে হেয় করার জন্য কাগজে প্রবন্ধাদি লিখিয়েছি। এটি আপনার মানহানিকর উক্তি, এই ভিত্তিহীন কুৎসার প্রমাণ দাখিল করার জন্য আমি আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছি।

“আপনি অনুযোগ করেছেন বিল সম্বন্ধে আমার মন্তব্য বা সমালোচনা ধ্বংসাত্মক। বিল-এর যেসব ধারায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারসাধন ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য পৃথক বোর্ড গঠনের প্রস্তাব আছে, সেগুলি আমার কাছে ও সেনেট-এর অন্য সদস্যদের কাছে ঘোরতরভাবে আপত্তিজনক মনে হয়েছে। আমরা আমাদের মন্তব্য খোলাখুলিভাবে সেনেট-এর প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করে বলেছি এসব ধারা রাজনীতিক উদ্দেশ্যপ্রসূত—শিক্ষার দিক থেকে ভেবে এসব প্রস্তাব করা হয়নি। আপনার চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে যে আমাদের মন্তব্য বা সমালোচনা রচনাত্মক হয়নি বলে আপনি দুঃখিত হয়েছেন। কিন্তু আপনার সরকারের মঙ্গল চিন্তা করে আপনি তো কখনো

বিশ্ববিদ্যালয়কে কোনো রচনাত্মক পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে বলেন নি। আপনার নিশ্চয় স্মরণ থাকবে আমি একাধিকবার বলেছি যে সেনেট-এর সদস্য ও আপনার সরকারের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের সহায়তা নিয়ে আমি একটি বিল-এর খসড়া তৈরি করতে রাজি আছি। কিন্তু আপনার দিক থেকে এ বিষয়ে কোনো সাড়া পাইনি। হৃদয়বিদারক মৃত্যুশোকের মধ্যেও আমি উপর্যুপরি চিঠিতে বিল-এর বিভিন্ন ধারা সম্বন্ধে আমার মতামত বিশদ করে লিখে পাঠিয়েছি। আমার সেসব সমালোচনার কোনো জবাব দেওয়া আপনি উচিত মনে করেন নি। বরঞ্চ দেখেছি যে যদিচ ১৯২৩ সালের ১১ জানুয়ারি তারিখের চিঠিতে আপনি জানিয়েছিলেন যে আমি যেমন বলেছিলাম তেমনি প্রস্তাবিত সংশোধনগুলি আপনার সংশোধনী বিল মোতাবেক করা সম্ভব হবে না সে বিষয়ে আপনি স্থির বুঝতে পেরেছেন, তত্রাচ তার কিছুদিনের মধ্যে জানতে পেরে আশ্চর্য হলাম যে ওই একই সংশোধনী বিলটিকেই আপনি দাঁড় করাতে চাইছেন এবং ভারত সরকারের কাছে পাঠিয়েও দিয়েছেন মঞ্জুরীর জন্য। উপরন্তু, দুটি বিলই বিবেচনা করার জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হয়েছিল, সেই কমিটি প্রচুর পরিশ্রম করে বিল-এর প্রত্যেকটি ধারা সূক্ষ্মভাবে বিচার করে এই সিদ্ধান্তে এসেছিল যে-উদ্দেশ্যে বিল দুটি রচিত তা বিনা প্রতিবাদে মেনে নেওয়া যায় না। কামটির এই রিপোর্ট যাতে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে পারি, আপনি সেই সুবিধাটুকুও আমায় দেননি। আমাদের মতামত সম্বন্ধে আপনার মতামত লিখিত মতে জানাতেও চাননি।

"আপনি অভিযোগ করেছেন যে আমি নাকি আপনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লোকেদের কাছে ভুলভাবে উপস্থিত করেছি। আপনার এ অভিযোগ আমি কিছুতে মেনে নিতে পারি না। আপনার যদি সাহস থাকে তা হলে এ বিষয়ে সমস্ত দলিল মায় আপনার আমার মধ্যে যেসব পত্র বিনিময় হয়েছে– সব লোকচক্ষুর গোচর করুন। পক্ষপাতহীন জনগণ এই সমস্ত

কাগজপত্র দেখে আমার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে যেমনই রায় দিক না কেন, আমি মাথা পেতে মেনে নিতে রাজি।

"সর্বশেষে অনেকগুলি শর্তসাপেক্ষে আমায় ভাইস চ্যান্সেলররূপে আপনার পুনর্নিয়োগের প্রস্তাবের প্রসঙ্গে আসছি। আপনার চিঠিতে এমন কিছু কথা আছে যা থেকে মনে হতে পারে যেন আমি ওই পদের জন্য উমেদার এবং আপনি আমায় ওই কাজে বহাল করবেন—এই না কি আমার প্রত্যাশা। গোড়াতেই বলে রাখতে চাই আপনি কিংবা আপনার মন্ত্রীর যদি সেরকম কোনো ধারণা থাকে—আপনারা খুবই ভুল ভেবেছেন। আপনি চান যে বিরোধিতার বদলে আপনার সঙ্গে সর্ববিধ সহযোগ করব—এইরকম একটি প্রতিশ্রুতি আমায় দিতে হবে। গত দশ বছর ধরে আমি এই পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালে এই পদাধিকার সংক্রান্ত যে ঐতিহ্য গঠিত হয়েছে, তা দেখছি আপনার জানা নেই···জেনে রাখুন এ ঐতিহ্য আমার সৃষ্ট নয়। এই পদে অধিষ্ঠিত হবার আগে দীর্ঘ সতেরো বছর কাল আমি পর পর আটজন ভাইস চ্যান্সেলর-এর সঙ্গে সিণ্ডিকেট-এর সদস্যরূপে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। তাঁদের প্রত্যেকে না হলেও অধিকাংশ ভাইস চ্যান্সেলর, প্রখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে এই পদাধিকারের মহৎ ঐতিহ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাঁদের অনেকে সম্রাটের পক্ষে হয়ে ন্যায় বিচার করার জন্য শপথ গ্রহণও করেছিলেন। তাঁরা যদি একথা শুনতে পান যে যেহেতু ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ করাটা সরকারের হাতে, সেই কারণে সরকারের মতামতের সঙ্গে ভাইস চ্যান্সেলর তাঁর মতামত মানিয়ে চলবেন বলে আশা করা যায়—তাহলে খুবই আশ্চর্যান্বিত হবেন। আমি বলতে চাই যে আমার পদাধিকারের সযত্নপোষিত ঐতিহ্যগুলি আমি এ পর্যন্ত যথাযথভাবে পালন করে এসেছি। গত দু বছর ধরে ঘুণাক্ষরে আমার মনে হয়নি যে আপনি চান আমি সরকারের মতে মত দিয়ে চলব···আপনাকে কিংবা আপনার মন্ত্রী

মহোদয়কে খুশি করার জন্য কিছুমাত্র ব্যগ্রতা আমি দেখাইনি। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও বলব যে সর্বদা চেষ্টা করে গেছি যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের হিত হয় ও মঙ্গল হয়। আমার কথায় আপনারা কান না দিলেও নিয়ত চেষ্টা করেছি যেন সরকার ভুল পথে না যান···। সরকারের হুকুম সর্বদা তামিল করবেন ও সেনেট-এ সরকারের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করবেন, এমন একজন জো-হুকুম ভাইস চ্যান্সেলর সংগ্রহ করা আপনার পক্ষে অসম্ভব না হতে পারে। তিনি সরকারের বিশ্বাসভাজনও হতে পারেন, কিন্তু এমন একজন ব্যক্তিকে সেনেট বিশ্বাস করবেন না, দেশের লোকও না।....

"একজন আত্মসম্মানী ব্যক্তি বিনা দ্বিধায় আপনার পত্রের প্রত্যুত্তরে কেবল একটি কথাই বলতে পারে, আপনি ও আপনার উপদেষ্টামণ্ডলী ঠিক এইরকম একটি জবাবই নিশ্চয় আমার কাছ থেকে পাওয়া যাবে বলে পথ চেয়ে আছেন। আমার সে উত্তর হল আর কিছু নয়—আপনি যে অপমান-কর প্রস্তাব করেছেন আমি তা প্রত্যাখান করলাম।"

একাদশ অধ্যায়

স্যাডলার কমিশন

১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করেন। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ও লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর স্যার মাইকেল স্যাড্লার। অন্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ডক্টর জে. ডব্লিউ গ্রেগরি, প্রফেসর র‍্যাম্‌সে মূর, মিঃ (পরে স্যর) পি. জে. হার্টগ, ডক্টর (পরে স্যর) জিয়াউদ্দীন আমেদ, অনারেবল ডব্লিউ. ডব্লিউ. হর্নেল এবং অনারেবল স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

কমিশনের বহু-বিতর্কিত সদস্য ছিলেন নিঃসন্দেহে আশুতোষ। ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগ থেকে একেবারে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চলেছিল তাঁকে কমিশন থেকে বাইরে রাখার। সংশ্লিষ্ট সকলেই বুঝেছিল তাঁকে নিয়োগ করা মানে তাদের সমস্ত অভিসন্ধি বানচাল হওয়া, কারণ তারা এটুকু বুঝেছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ধিসন্ধি সমস্ত আশুতোষের নখদর্পণে থাকায়, কমিশনে তাঁর প্রভাব অন্য সকলের প্রভাবকে ছাপিয়ে যাবে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি ভারত সরকারের বিরূপতার সঙ্গে শিক্ষার সম্বন্ধ সামান্যই ছিল, আসলে কারণটা ছিল রাজনীতিক। শিক্ষা-সংস্কারের ব্যাপারটা ছিল নিতান্তই বহিরঙ্গ, সত্যকার উদ্দেশ্যটা ছিল আশুতোষ এবং তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়কে হেয় প্রতিপন্ন করা।

১৯১৫ সালের অক্টোবর মাসে ভারত সরকারের শিক্ষা সদস্য স্যর হারকোর্ট বাটলার তাঁর নোটে যা লিখেছিলেন তা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় প্রকৃত উদ্দেশ্য কী ছিল। তিনি বলেছিলেন: "বিচার্য প্রশ্নটি শিক্ষাঘটিত

যেমন তেমনি আবার রাজনীতিঘটিতও। কলকাতার বাঙালী সমাজ যে কোনো অজুহাতে একটা রাজনীতিক আন্দোলন খাড়া করার জন্য সর্বদা নিসপিস করে। বাংলা সরকার যে সদাসর্বদা আমাদের মদৎ জোগাবেন—এমন বিশ্বাস করা কঠিন। মিষ্টার লিওন ও মিষ্টার হর্নেল-এর মধ্যে মতদ্বৈধ মেটেনি। স্যর আশুতোষের রাগের জ্বালা এখনো প্রশমিত হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো তাঁর প্রভাব কিছু কম নয়। তিনি সর্বান্তঃকরণে ভারত সরকারকে ঘৃণা করেন। স্যর আশুতোষ সর্বশক্তিমান থাকতে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা তদন্ত কমিশন বসিয়েও কিছু যে করতে পারব মনে হয় না। বাংলা সরকারের প্রস্তাব স্যর আশুতোষকে যেন কমিটিতে নেওয়া হয়। সেনেট থেকে স্যর আশুতোষের কিছু তাঁবেদার লোককে আমরা সরিয়ে দিয়েছি। তার ফলে সুফল ফলতে শুরু করেছে।

স্যর হারকোর্ট-এর এইসব কথা পড়ে মনে হয় গাছে না চড়েই তিনি এক কাঁদির স্বপ্ন দেখেছিলেন। কার্যকালে দেখা গেল একেবারে সূচনা থেকেই স্যর মাইকেল ও স্যর আশুতোষ পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে এক যোগে কাজ করেছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন-এর কাজ আশাতীত স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে চলেছে। ১৯১৯ সালে পাঁচটি বিরাট খণ্ডে যখন স্যাড্‌লার কমিশন-এর সম্পূর্ণ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, অনেকেই একে অভিনন্দিত করেন "শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে বিজ্ঞতার চরম নিদর্শন" রূপে।

প্রায় সকল ব্যাপারেই স্যর মাইকেল আশুতোষের সঙ্গে এক মত হয়েছিলেন। কোনো বিষয়েই আশুতোষকে ভিন্ন মত দিতে হয় নি। রিপোর্ট-এর খসড়ায় ত্রুটিবিচ্যুতি কিছু যে না ছিল এমন নয়, কিন্তু সুযুক্তির প্রয়োগ করে আশুতোষ স্যর মাইকেলকে স্বমতে আনতে পেরেছিলেন। আসলে তিনি চেয়েছিলেন সংস্কার একটা যেন হয় এবং অযথা বিলম্ব না করেই যেন হয়। ১৯১৪ সালে অর্থাৎ কমিশন বসবার তিন বছর আগেই, লর্ড

কারমাইকেল আশুতোষের বিষয়ে বলতে গিয়ে লিখেছিলেন, "তিনি চেয়েছিলেন সংস্কার যেন একটা ঘটে, এবং সেটা ঘটতে যেন অযথা বিলম্ব না হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি বিষয়ে স্যর আশুতোষের সঙ্গে একাধিকবার আমি কথা বলে দেখেছি। তিনি বলতেন তিনি নিজেই যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ নির্দিষ্ট করে সেই লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্য কাজ করতে পারতেন, তাহলে তা অন্যদের দ্বারা নির্দিষ্ট আদর্শ (যার রূপায়ণ তাঁকেই করতে বলা হয়), থেকে বহুলাংশে পৃথক হত।"

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের কাজ এমনভাবে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছিল যে, শুরুতেই বুঝা গিয়েছিল যে কমিশন যা সুপারিশ করবেন তা কেবল কলকাতার জন্য সীমিত রাখা ঠিক হবে না, ভারতের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও তার সুযোগ-সুবিধা যেন নিতে পারেন তেমন ব্যবস্থা রাখতে হবে। সুতরাং কমিশনের কাজটা হয়েছিল সকল ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কথা ভেবে এবং কলকাতা ছাড়া অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ও কমিশনের রিপোর্ট থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করতে পেরেছিল।

কিন্তু এই রিপোর্টের প্রধান ত্রুটি ছিল শিক্ষার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা স্বীকার করে নেওয়া। এরই ফলে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন হয়।

বিদেশী সরকার আশুতোষের দেশাত্মবোধ বরদাস্ত করতে পারেন নি ; মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন আশুতোষের স্বাজাত্য গর্বকে নাড়া দিতে হবে কলকাতার প্রতিপক্ষ রূপে বাংলা দেশেই অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় খাড়া করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রপাত হয় আশুতোষ ও কলকাতার বিরুদ্ধে ভারত সরকারের বৈরিতার ফলে।

১৯১৫ সালের ৪ অক্টোবর তারিখের একটি নোটে স্যর হারকোর্ট বাটলার বলেছিলেন, "সম্মুখ সমরে আশুতোষকে বাগে আনা যাবে না। ওঁর পাশ কেটে বেরিয়ে গিয়ে ওঁকে ও কলকাতাকে জব্দ করতে হবে।

আমাদের ঢাকা পরিকল্পনা সেই কথা ভেবে প্রস্তুত করা হয়েছে। এটা যুদ্ধের একটা কৌশল।"

স্যাড্‌লার কমিশনের রিপোর্ট বিশদভাবে আলোচনা করার দরকার এখানে নেই। আমরা কেবল অনাথনাথ বসুর একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি। তিনি বলেছেন এই রিপোর্ট-এর আদর্শ হল লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ে হলডেন্ কমিটির রিপোর্ট। সেই রিপোর্টেও মাধ্যমিক, কলেজিয়েট ও য়ুনিভার্সিটি শিক্ষার বিষয় আলোচিত হয়েছে।

সূচনা থেকেই কমিশন স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে মাধ্যমিক শিক্ষায় আমূল সংস্কার না ঘটা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ঢেলে সাজাবার কোনো প্রসঙ্গ হতেই পারে না। মাধ্যমিক শিক্ষার সাফল্যের উপর কলেজী শিক্ষা যেমন নির্ভরশীল, স্নাতকোত্তর শিক্ষা তেমনি কলেজী শিক্ষার সাফল্যের উপর নির্ভর করতে বাধ্য। এবিষয়ে স্যর মাইকেল ও স্যর আশুতোষ সম্পূর্ণ একমত হয়েছিলেন।

আশুতোষ মুখ্যত চেয়েছিলেন মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার সাধন, কলেজ-গুলিতে যথেষ্ট সংখ্যায় যথোচিত গুণসম্পন্ন অধ্যাপকের নিয়োগ ও কলেজ-গুলি সুপরিচালিত হচ্ছে কি না তার পরিদর্শন ব্যবস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও প্রশাসন ব্যবস্থায় স্বায়ত্তশাসন এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষণের সম্প্রসারণ। কমিশন তাঁর প্রত্যেকটি দাবি ন্যায্য বলে মেনে নিয়েছিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

বয়কট আন্দোলন

"বয়কট" নামটা আইরিশ, আয়রলণ্ডের 'সিনফেইন' আদর্শে যে ধরনের ধর্মঘট আন্দোলন করা হয় তাকে বয়কট বলে।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর শিক্ষাক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার জন্য সারা প্রদেশে একটা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ফলে সরকার পরিচালিত স্কুল-কলেজ পরিহার করে 'ন্যাশনাল' স্কুল-কলেজ স্থাপন করার একটা আগ্রহ দেখা দেয়। অর্থের অভাবে এইসব 'ন্যাশনাল' স্কুল-কলেজে যোগ্য গুন-সম্পন্ন অধ্যাপক নিয়োগ করা সম্ভবপর হয় নি বলে, বেশির ভাগই অকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। তখনকার প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বেঁচে আছে একমাত্র যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ—যা এখন পুরোপুরি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করেছে।

শিক্ষা-সংক্রান্ত এই নূতন আন্দোলনের একেবারে পুরোভাগে এক সময় রবীন্দ্রনাথও নেমেছিলেন। তবে শুরুতেই তিনি সাবধান করে বলেছিলেন যে যদি সত্যকার স্বদেশী শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে এই আন্দোলন চালানো হয়, তাহলেই আন্দোলন সফল হতে পারে। তবে যদি শিক্ষাকে শিখণ্ডী-রূপে খাড়া করে রাজনীতিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় তাহলে স্বদেশী শিক্ষা কেন, কোনো শিক্ষাই হবে না—মায় আত্মনির্ভরতার শিক্ষাও বানচাল হবে। ১৯৬২ সালে আমার লিখিত 'Social thinking of Rabindranath Tagore' বইয়ে আমি লিখেছি: "কবি বলতেন টিকে থাকার যুদ্ধে কেবল সেইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দাঁড়িয়ে যাবে যারা কি না সত্যই সমাজের সেবায় লাগতে পারবে। তাঁর এ-উক্তির প্রমাণস্বরূপ বলা যায় যে পার্টিশনের যুগে

যেসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পত্তন হয়েছিল তাদের মধ্যে একমাত্র টিকে আছে যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ যা নাকি এখন একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত। তার মানে অবশ্য এই নয় যে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে নিছক সামাজিক উপযোগিতার দিক থেকে বিচার করতেন। বরঞ্চ তাঁর ধারণায় শিক্ষার মুখ্য লক্ষ্য হওয়া উচিত পূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ। যে শিক্ষা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য বিকশিত না করে, যথোচিত পরিমাণে তাকে স্বনির্ভর হতে না শেখায়, সে শিক্ষা বিফল বলেই তার টিকে থাকার উপায় নেই। জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পত্তন করা নিয়ে এই শতাব্দীর শুরুতে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল, তা সফল হল না এই কারণে যে মুখ্যত এই আন্দোলনের প্রেরণা ছিল রাজনৈতিক—শিক্ষাগত নয়। তদানীন্তন রাজশক্তির শাসন-পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্যই এই সংগ্রাম, শিক্ষাপদ্ধতির ব্যাপারটা ছিল নিতান্তই গৌণ। লক্ষ্য সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিত না হয়েই ভুল দিকে চললে যে অযথা শক্তিক্ষয় হবে—কবি সে বিষয়ে সাবধানবাণী সোচ্চারে ঘোষণা করেছিলেন প্রথম থেকেই। কিন্তু দেশভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসের ডামাডোলের মধ্যে কবির কণ্ঠ শোনার মতো দেশের তখন অবস্থা ছিল না।" স্যর মাইকেল স্যাড্‌লার বলেছেন, "কবি নৈরাজ্যবাদকে যেমন ভয় করতেন তেমনি ঘৃণাও করতেন।" কিন্তু সেইটুকু বললে যথেষ্ট বলা হয় না। আসল ব্যাপারটা হয়েছিল গুরুতর, পঞ্চাশ হাজার ছাত্র বেরিয়ে এসেছিল স্কুল ছেড়ে, হাজার হাজার কলেজী ছাত্র জীবিকা অর্জনের প্রস্তুতির মাঝ পথে কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। যারা গরম গরম বক্তৃতা শুনে বইপত্র পরিহার করেছিল তাদের পড়তে হয়েছিল সমূহ সংকটে।

দেশের শক্তির এই নিদারুণ অবক্ষয়ে আশুতোষ কেবল যে বিচলিত হয়েছিলেন এমন নয়, একটা আতঙ্কমিশ্রিত জুগুপ্সায় তাঁর সমস্ত মন ভরে উঠেছিল।

এর ফলে প্রত্যক্ষত যে সমস্যার মুখোমুখি তাঁকে দাঁড়াতে হয় সে হল

তাঁর বহুবাঞ্ছিত স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠন ও গবেষণা বিভাগ নিয়ে। এটি প্রচুর সময় ও শ্রম স্বীকার করে তিনি তখন সদ্য গড়ে তুলতে লেগেছেন। ঠিক সেই সময়ে বয়কট আন্দোলন এসে তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা বিপর্যস্ত প্রায় করে তুলেছিল। যে বিশ্ববিদ্যালয়কে ছাত্রদের দেয় নানারকম দক্ষিণা-নির্ভর হয়ে টিকে থাকতে হয়, যখন হাজারে হাজারে ছাত্ররা স্কুল-কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে গেল তখন তো তার এক প্রকার প্রায় দেউলিয়া অবস্থা। সে অবস্থায় আশুতোষ কী করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন ?

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা তাঁর কাছে আদর্শ মাত্র ছিল না, ছিল নিতান্তই বাস্তব প্রতিদিনের সমস্যা। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুরবস্থায় তিনি যে মনে মনে কী পরিমাণ অস্থির হয়েছিলেন, তা সহজেই অনুমেয়। তাঁর সমস্ত আশাভরসার তরী যেন তীরে এসে ডুবে যাবার মতো হল।

অসহযোগ আন্দোলন যখন চরমে উঠেছে, সে সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেট হাউসের সোপান থেকে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা থেকে তাঁর মনোভঙ্গজনিত গভীর বেদনার একটা পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সেই বক্তৃতায় ছাত্রদের সম্ভাষণ করে বলেছিলেন :

"তোমরা স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয় চাও। এই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কী তোমাদের সেই স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয় নয় ? এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও সিণ্ডিকেট-এর গরিষ্ঠ সংখ্যক সদস্য তোমাদের স্বদেশবাসী। এই বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থানুকূল্য করে লালনপালন করছেন তোমাদেরই দেশের লোক। তাঁদের প্রত্যেকে জাতীয় ভাষায় কথা বলেন, জাতীয় পোশাকই তাঁদের পরিচ্ছদ। এখানে বিদেশী প্রভাব তো নেই। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে যাঁরা ব্রতী আছেন তাঁদের ত্যাগ ও দেশভক্তিকে তোমরা কী অসম্মান করতে চাও ?"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কতিপয় উল্লেখযোগ্য বক্তৃতার উদ্ধৃতি

শিক্ষা জগতে তিনি মহাসনের অধিকারী ছিলেন বলে, দেশের নানা জায়গা থেকে প্রায়ই আশুতোষের ডাক পড়ত। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি উপদেশ নির্দেশের আশায় তাঁর দ্বারস্থ তো হতই, উপরন্তু বহু বৈজ্ঞানিক অথবা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানেও তিনি বক্তৃতা দেবার জন্য আহূত হতেন। তাঁর জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তার আদর ছিল সর্বত্র।

উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি পাশ্চাত্ত্য আদর্শ অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন। এসব ব্যাপারে তাঁর কোনো সংকীর্ণতা বা প্রাদেশিকতা ছিল না। তিনি জানতেন জ্ঞানের রাজ্যে ভৌগোলিক সীমারেখা নেই। বিদ্যা আহরণ করতে গেলে প্রাচ্যে-পাশ্চাত্ত্যে প্রভেদ রাখা নিরর্থক।

১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তনে তিনি বলেছিলেন: "হিমালয়ের তুষার শৃঙ্গে বসে ভারতের অতীত গৌরবের ধ্যানে নিমজ্জিত থাকলে আমাদের চলবে না···বিশেষ কোনো সিদ্ধান্ত বা পদ্ধতির এককালে কদর ছিল বলে সেগুলি যদি আমরা সবলে আঁকড়ে ধরে বসে থাকি তাহলে অনর্থক সময় নষ্ট ও শক্তি ক্ষয়···বিশ্বব্যাপী বিরাট পরিবর্তনের ঢেউ এসে তার দুর্দম গতিবেগে স্থাণু ও অচল কত কি ক্রমাগত ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে···যে অতীত বিজিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত তাকে আঁকড়ে থাকা যেমন বিড়ম্বনা তাকে নিয়ে গৌরব করাও তেমনি··· অনাগত কাল বিজয়যাত্রায় বেরিয়েছে···সমস্ত শক্তিতে সেই যাত্রাপথ সুগম করার কাছে আমাদের ব্রতী হতে হবে···। আসুন সোচ্চার প্রতিবাদে

আমরা বলি জীবনস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা স্থিরনিশ্চল আত্মহননের কূপে নিমজ্জিত হতে চাই না।"

১৯১৯ সালে কলকাতায় যে সায়েন্স কনভেনশন* হয় তার সভাপতি হিসাবে আশুতোষ তাঁর ভাষণে এদেশে বিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণার মূল সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কী কলায়, কী বিজ্ঞানে, প্রকর্ষের চরম যদি লক্ষ্য হয় তা হলে গবেষককে স্বাধীনভাবে মনন, চিন্তন ও গবেষণার সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। তিনি বলেছিলেন, "জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের যেসব কর্মী কাজ করে চলেছেন, তাঁরা আর কিছু চান না, চান এমন একটু সহানুভূতি যা তাঁদের প্রোৎসাহিত করবে। তাঁরা পৃষ্ঠপোষকের করুণার ভিখারী নন আবার তাঁদের কাজে অযথা হস্তক্ষেপও চান না।"

১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায় তিনি বলেছিলেন, "শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল কথাটা হল এই যে, যেসব বিষয়ের বিশ্বমানবিক মূল্য আছে সেগুলি নিঃসন্দেহে শিক্ষার বিষয়। কিন্তু যতক্ষণ না সে বিষয় বাস্তবরূপে আমাদের প্রত্যক্ষ হয়ে না উঠে ততক্ষণ বিশ্বমানবিক সত্য নিছক তত্ত্বরূপেই থাকে। এই কারণেই বলি, পাশ্চাত্ত্যের যাকিছু ভালো বা শ্রেষ্ঠ তা স্বীকার করে নিতে কিংবা গ্রহণ করতে আমাদের যদিচ কোনো দ্বিধা নেই, আমাদের জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষগোচর শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলির সংরক্ষণ সংবর্ধন আমাদের সর্বথা কর্তব্য।" সাংস্কৃতিক ব্যাপারে তাঁর মনোভাব বিশদ করার জন্য আশুতোষ এই কথা বলার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির যেসব সম্পদ বিশ্বমানবিক মূল্যে সমৃদ্ধ, সেগুলি স্বীকার করে নিতে তাঁর কোনো আপত্তি ছিল না, তাঁর আপত্তি ছিল সেই জায়গায় যেখানে অনুরূপ মূল্যে মূল্যবান স্বদেশী সংস্কৃতির সম্ভার, স্বদেশী বলেই স্বদেশের লোকের দ্বারা উপেক্ষিত হত। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে

* ১৯১৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে সায়েন্স কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে আশুতোষ যে ভাষণ দেন তা পরিশিষ্ট (খ)-এ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

দেশী হোক বিদেশী হোক, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদগুলির মধ্যে তিনি সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন। এই কথাটা যদি আমরা মনে না রাখি তাহলে আশুতোষের মহীশূর অভিভাষণের বিকৃত অর্থ করা যেতে পারে।

আশুতোষের চিত্তের প্রসার, নানা বিষয়ে তাঁর উদ্দীপ্ত আগ্রহ—সম্বন্ধে আমাদের বেশি করে জানা উচিত। নানা বিষয়ে তাঁর জ্ঞান থাকায়, জ্ঞানের রাজ্যে তিনি স্বেচ্ছাবিচরণ তো করতেনই, নানা বিষয়ে বলতেও পারতেন বিশারদের মতো।

বিহার ও ওড়িশার গভর্নর স্যর হেন্‌রি হুইলার-এর সভাপতিত্বে পাটনার গভর্নমেণ্ট হাউস-এ বিহার-ওড়িশা ঐতিহাসিক সমিতির বাৎসরিক সভায় ইতিহাসের গবেষণা নিয়ে আশুতোষ যা বলেছিলেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সেই বক্তৃতার সামান্য খণ্ডাংশ নিচে তুলে দেওয়া হল। ঐতিহাসিক গবেষণা নিয়ে তিনি যেসব তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছিলেন, ইতিহাসে পাণ্ডিত্য না থাকলে তেমন কথা কেউ বলতে পারত না।

তিনি বলেছিলেন: "ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী থেকে ফ্রান্সিস বুকানন্‌-এর মহামূল্য মূল দিনলিপি থেকে অংশবিশেষ আপনারা প্রকাশ করেছেন দেখে আমি বিশেষ প্রীত হয়েছি। এই ধরনের অপর একটি কাজের প্রস্তাব আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি। প্রিন্সিপাল জন ওয়াট্‌সন ম্যাকক্রিণ্ডল-এর পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ, কিন্তু তা নিয়ে তাঁর কোনো অহমিকা ছিল না। এই শহরে বসেই আজীবন সাধনায় তিনি যে দুটি প্রাচীন দেশ—গ্রীস ও ভারত—জ্ঞানের গরিমায় সভ্যতার উচ্চতম শিখরে এককালে অধিষ্ঠিত ছিল, তাদের পারস্পরিক প্রভাব নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করে গেছেন। তাঁর সেইসব লেখা যদি সযত্নে সম্পাদনা করা হয়, আধুনিকতম গবেষণার ভিত্তিতে প্রয়োজন মত পরিবর্তন পরিবর্জন করে একটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ সংস্করণ যদি প্রকাশ করা হয় তাহলে পণ্ডিতদের সাধুবাদ ছাড়া প্রকাশনের ব্যয়টুকুও আপনারা ফিরে পাবেন বলে আমার ধারণা।

"শ্রীযুক্ত জয়সোয়ালের দ্বারা কতিপয় সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির আবিষ্কার ও উদ্ধারকার্য বিষয়ে এই সুযোগে আমি কিছু যদি না বলি, আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকে। একাজ করতে গিয়ে তাঁকে পুরাতত্ত্বের সঙ্গে কিঞ্চিৎ আইনেরও চর্চা করতে হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আমার স্বতঃই মনে উদয় হচ্ছে আপনাদের এই প্রদেশে কত যে গুপ্তধন লুপ্ত হয়ে আছে তার ইয়ত্তা নেই। ওড়িশা ও বিহার প্রাচীন পুঁথির রত্নকোষ। শোনা যায় কেবলমাত্র পুরী জেলায় তালপাতার পুঁথির সংখ্যা প্রায় দুইলক্ষ। ত্রিহুত অঞ্চলেও নাকি প্রাচীন পুঁথির বিরাট সংগ্রহ আছে। রাজা মহারাজাদের প্রাসাদে যেমন, অকিঞ্চন পুরোহিত পণ্ডিতদের কুটিরেও তেমনি নাকি পুঁথির সংগ্রহ দেখা যায়। এই অমূল্য সম্পদ কালের দ্বারা কবলিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার পূর্বেই, সুষ্ঠুভাবে এই সম্পদের সন্ধান করা উচিত ও পুঁথির বিষয়ে সর্বশেষ তথ্যাদি সংগ্রহ করা উচিত।

খুবই আশা ও আনন্দের কথা এই যে ইসলামিক বিদ্যার ক্ষেত্রে, প্রাচীন পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহণ ও সংরক্ষণের কাজে ইতিপূর্বেই হাত দেওয়া হয়েছে এই প্রদেশে। আমলাতন্ত্রী না হয়েও একজন জ্ঞানী, গুণী ও বদান্য ব্যক্তি যদি এইরকম কাজে নিবিষ্টচিত্ত হন, যদি যথোচিত সতর্কতার সঙ্গে তিনি অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যেতে পারেন, সংরক্ষণের ব্যাপারে যদি তিনি যথেষ্ট যত্নশীল হন, শরীর স্বাস্থ্য কিংবা অর্থ সামর্থ্যের বিষয় বিবেচনা না করেই যদি তিনি এগিয়ে যেতে প্রস্তুত থাকেন, তাহলে একজন সাধারণ নাগরিক যে কতোখানি করতে পারেন—তার দৃষ্টান্ত হলেন আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর পরলোকগত খুদাবক্স। খুদাবক্স লাইব্রেরী সংগ্রহ প্রথম যখন সন্দর্শন করি আজ থেকে বহু বৎসর পূর্বে, তখন দেহে মনে একটি যে পুলক শিহরণ অনুভব করেছিলাম, সেকথা এখনো আমার স্পষ্ট স্মরণে আছে। তাঁর এই যে অনন্য ও অমূল্য সংগ্রহ—এখানে পণ্ডিত গবেষকগণ পুরুষানুক্রমে কাজ করে যেতে পারেন।....সংগৃহীত পুঁথি পুস্তকাদির গ্রন্থপঞ্জীও

কেমন চমৎকারভাবে সংকলিত। আর পুঁথি পুস্তকের কথা তো বলাই বাহুল্য—প্রত্যেকটি পণ্ডিতদের হর্ষ ও সংগ্রাহকের গর্ব উৎপাদন করার মতো। আইনবিষয়ক পুঁথি পুস্তকের সংগ্রহ তো প্রথম শ্রেণীর। খুদাবক্স লাইব্রেরী সংগ্রহে আইনশাস্ত্র বিষয়ে আবু হাসিন্-এর গ্রন্থ রয়েছে—শোনা যায় পৃথিবীতে ওইটিই একমাত্র কপি।

"বিজ্ঞান বিষয়ক পুঁথিপত্রের সংগ্রহও কম উল্লেখযোগ্য নয়। চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়েও একই কথা বলা যায়। জাহরাবিশ-এর শল্য চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ যদি প্রকাশ করা যায়, তাহলে শল্য চিকিৎসার যেসব যন্ত্রপাতি য়ুরোপ আবিষ্কার করেছে বলে দাবি করে, সে দাবি প্রমাণসহ হবে কিনা সন্দেহ।

"ইসলামের রাজনীতি ও শাসননীতি বিষয়ে আমার বহুকালের আগ্রহ। সর্ব প্রথম ফ্লুগেল এই বিষয় নিয়ে চর্চা করেছিলেন। তাঁর পরে এ বিষয়ে কেউ তত আগ্রহ দেখিয়েছেন কিনা জানা নেই। খুবই সম্প্রতি প্রফেসর মেৎজ্ এই অজ্ঞাত সাধারণ বিষয়ের উপর অনেকখানি আলোক সম্পাত করেছেন। কিন্তু জর্মন ভাষা যাঁরা জানেন না তাঁদের কাছে ফ্লুগেল ও মেৎজ্ কেবল দুটি নাম মাত্র। ইসলামিক মনীষীরা প্লেটো ও অরিষ্টটল-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতেন। সেদিক থেকে তাঁরা হবস্, লক ও অন্যান্য য়ুরোপীয় চিন্তানায়কদের পূর্বসূরী।

"আপনাদের সাধ্যানুসারে আপনারা যেন ইসলামিক জ্ঞানের গবেষণায় সহযোগ করেন। এই প্রস্তাবের উপর আমি গুরুত্ব আরোপ করছি বলে আপনারা আমায় যেন ভুল না বুঝেন। ব্রিটিশ ও য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এই বিষয়ের গবেষণায় কী চমৎকার কাজ করে চলেছেন, সেকথাটা আপনারা মনে রাখবেন।

"একটা সময় ছিল যখন ইসলাম জ্ঞানের দীপবর্তিকা উজ্জ্বল করে সারা বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছিল। গ্রীক, পারসিক ও হিন্দু গ্রন্থাদি সংগ্রহ

করে অনুবাদ করে, বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছিল তারাই। ঐতিহাসিক মাস্থদি গর্বে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে পঠন-পাঠন অধ্যয়নে ইসলামের গভীর নিষ্ঠা ও আগ্রহের বিষয়ে কত কথা বলেছেন! আজ যদি তাঁরা তাঁদের এই ধর্মীয় কর্তব্য থেকে বিরত হয়ে থাকেন, তাঁদের ইতিহাসের নানা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই নিতান্ত সাময়িক ত্রুটি সংশোধনে নিশ্চয় তাঁদের সহায় হবে।"

চতুর্দশ অধ্যায়

রাজনৈতিক কাজের গৌণ ভূমিকা

জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তায়, সাহসে ও অক্লান্ত পরিশ্রমের শক্তিতে আশুতোষ এমনই অসাধারণ ছিলেন যে তখনকার রেওয়াজ অনুসারে যদি তিনি রাজনীতিতে নাবতেন, তাহলে তাঁর যোগ্যতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকতনা। কিন্তু অনেকে আশ্চর্য হলেও রাজনীতি তিনি সযত্নে পরিহার করে চলতেন। বাইরে থেকে এটা অদ্ভুত মনে হলেও এতে আশ্চর্য কিছু ছিলনা। হয়তো রাজনীতি তাঁর ধাতেই সইতনা, কারণ তড়িঘড়ি একটা কিছু করে ফেলার মনোভাব তাঁর ছিলনা। শিক্ষাব্রতীরূপে তিনি আদর্শের দিকে অল্পে অল্পে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলার পক্ষপাতী ছিলেন। কয়েক ধাপ ডিঙিয়ে ঝটপট লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার কথা তিনি ভাবতেও পারতেন না।

স্যর মাইকেল স্যাড্‌লারকে লিখিত একটি চিঠিতে তিনি বলেছিলেন : "যতদিন আমরা বিদেশী শাসনের অধীনে আছি, আমাদের চরম লক্ষ্যবস্তু ঘোষণা করতে যাওয়াটা নিজেদেরই আঘাত করার তুল্য। দেশের পক্ষে সবচেয়ে বেশি যেটা দরকার, সে হল ব্যবহারিক জীবনে যেসব জরুরী সমস্যা দেখা দেয় তার নিরসনের প্রয়াস। লাগামছেঁড়া কল্পনার পাগলামি থেকে রক্ষা পাবার এটাই একমাত্র উপায়।"

পূর্বেই বলেছি রাজনীতিতে তাঁর অরুচির কারণটা ছিল হয়তো তাঁর মানস প্রকৃতির গঠন। শিক্ষা সম্পর্কিত তাঁর মনোভাব থেকে এটা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। যা আছে, যতটুকু আছে, তাই দিয়ে আপাতত কাজ শুরু করে দিতে হবে—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। গোপালকৃষ্ণ গোখলের মতো তিনিও স্থির বুঝেছিলেন সর্বাধিক শ্রেয়বস্তু লাভের আশায় উপস্থিত

হাতের কাছে যা পাওয়া যাচ্ছে—সে যদি গুণে ন্যূন পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতির শিক্ষাও হয়—তাকে পরিহার করতে যাওয়া এক ধরনের মূঢ়তা।

গোখলে একদা বলেছিলেন : "কেবল যে আমার মনে হয় এমন নয়, আমার স্থির বিশ্বাস ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে থেকে আমরা যতটুকু শিখতে পাই, সেটুকুই আমাদের পক্ষে মূল্যবান ও কার্যকর। উৎকর্ষের দিক থেকে সে শিক্ষা যদি সর্বোচ্চ মানের নাও হয়, সেই কারণে তাকে অবহেলা করা ঠিক নয়···। আজকের দিনে পাশ্চাত্ত্য প্রণালীর শিক্ষার দ্বারা সর্বোচ্চ জ্ঞান আহরণে আমরা প্রোৎসাহিত না হলেও, কেবল যদি প্রাচীনকালের ভাবধারার দাসত্ব থেকে ভারতের মনকে মুক্ত করতে পারি, এবং পাশ্চাত্ত্য জগতের জীবনযাত্রা, চিন্তাধারা ও চরিত্রের পরাকাষ্ঠা নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করতে পারি, তাহলে সেটা কিছু কম হবে না। সেইজন্য বলি কেবল সর্বোচ্চ শিক্ষা নয় পাশ্চাত্ত্য প্রণালীর সকল শিক্ষাই আমাদের পক্ষে মূল্যবান।"

পশ্চিমের জ্ঞানসম্পদ ও সংস্কৃতির মধ্যে আশুতোষের চিত্ত আপ্লুত থাকায় তিনিও গোখলের মতো ধারণা পোষণ করতেন ও বিশ্বাস করতেন যে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চিমের বীজ যদি পড়ে তাহলে উভয়ের সম্মেলনে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ হবে নিশ্চয়। এই কারণে ইংরেজী ভাষার মারফত যে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান তিনি নিজে আয়ত্ত করেছিলেন তা দেশের শিক্ষিত সমাজে বিস্তৃত করে দিতে মনস্থ করেছিলেন।

একাজে তিনি যে বহুল পরিমাণে সফল হয়েছিলেন, স্যাড্‌লার কমিশন পর্যন্ত সে কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন। কমিশন তাঁদের রিপোর্টে লিখেছিলেন : "সম্প্রতি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি কলেজের ধাপ পার হয়ে কৃষক সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরাও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে শুরু করেছে এবং ক্রমে তাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে লেগেছে। সরকারী চাকুরী পেতে হলে কিংবা উকিল ডাক্তার হতে গেলে, এই পথে চলা ছাড়া অন্য গতি নেই।

জাতিভেদের বেড়া ডিঙিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের এটাই একমাত্র উপায়। কৃষক সম্প্রদায় থেকে মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেও যদি উচ্চশিক্ষার উচ্চাশা জেগে থাকে, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের দিক থেকে তা খুবই উল্লেখযোগ্য ঘটনা। নূতন সমাজ গঠনের বিপ্লব প্রচেষ্টায় এ যেন এক প্রকার অগ্রদূত।”

আশুতোষ কেন যে রাজনীতি পরিহার করে চলতেন, উপরের উদ্ধৃতি থেকে তার কারণ অনেকটা স্পষ্ট হতে পারে। শিক্ষার সোজা রাস্তা দিয়ে যদি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা সম্ভবপর হয়, তাহলে রাজনীতির ঘুর পথে চলায় তাঁর আগ্রহ ছিলনা। বাস্তব পক্ষে রাজনীতির সঙ্গে—যদি অবশ্য তাকে রাজনীতি বলা যায়—একবারই তিনি প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসেছিলেন, সেই যেবার আদালত অবমাননার দায়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য তিনি জনগণকে সংঘবদ্ধ করে একটি শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব করেছিলেন।

এথেকে অনুমান করা অন্যায় হবেনা যে আশুতোষ সত্যই যদি রাজনীতিতে কখনো সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতেন, তাহলে তাঁর রাজনীতি হত লিবারেল রাজনীতি। যে রাজনীতিতে বিচারবুদ্ধির স্থান গৌণ এবং উচ্ছ্বাস উত্তেজনাই মুখ্য—সে রকম রাজনীতি তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন বলে মনে হয়না। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা অভিজ্ঞতা সবই ছিল লিবারেল পন্থী। গোখলের মনোভাবের সঙ্গে এই কারণেই তাঁর মনোভাবের এতটা সৌসাদৃশ্য। এই সঙ্গে বলা ভালো ঘটনাচক্রে যদি রাজনীতিতে তাঁকে নাবতেই হত তাহলে নিশ্চয় রচনাত্মক কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করতেন। তাঁর বিরাট প্রতিভা ও প্রশাসনিক দক্ষতা রচনাত্মক কাজেই সবচেয়ে স্ফূর্তি লাভ করতো নিশ্চয়। আশুতোষের মৃত্যুর পর স্যর মাইকেল স্যাড্‌লার বলেছিলেন, “তাঁর পরলোক গমনে পৃথিবী এমন একজন মহানায়ক হারাল যিনি সাম্রাজ্য শাসন করার ক্ষমতা রাখতেন।” সত্যই আশুতোষের সেই ক্ষমতা ছিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়

রাজনীতিতে নাবলে কী হতে পারত

লর্ড লীটন-এর অবিমৃষ্যকারিতার ফলে যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ থেকে আশুতোষ সহসা নিজেকে সরিয়ে নেন, নিশ্চয় তিনি রাজনীতিতে যোগ দেবার কথা গভীরভাবে ভেবে থাকবেন। রাজশক্তিতে তাঁর আস্থা শিথিল হবার ফলে, তিনি অনিবার্যভাবে বুঝে থাকবেন হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা না থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তাঁর সকল রকম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় দেশের অর্থভাণ্ডার যাঁদের হাতে, তাঁদের হাতেই চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণেরও এখতিয়ার। রাজার হাতেই যখন রাজকোষ তখন রাজশক্তি অধিকার না করলেই নয়।

এরকম দোটানার মধ্যে পড়ে বহু লোকেই সোজাসুজি রাজনীতির পথ বেছে নিয়েছেন। আমাদের দেশের সমাজ-জীবনে রাজনীতির এত যে কদর তার কারণ এরই মধ্যে নিহিত। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মনমেজাজ কিংবা শিক্ষাদীক্ষা রাজনীতির জীবন বেছে নেবার পরিপন্থী যদি হয়, সেকথা স্বতন্ত্র। কিন্তু তেমন যদি প্রয়োজন হয় তাহলে রাজনীতি সর্বথা পরিহার করার কোনো অর্থ হয়না।

এই ধরনের ভাবনা জেগেছিল একেবারে আশুতোষের জীবনের শেষ ভাগে। তিনি যদি স্বাধীন দেশের নাগরিক হতেন, শিক্ষার প্রসার কল্পে তাঁর ব্রত বা প্রয়াস হয়তো বাধাগ্রস্ত হতনা, হয়তো তাঁর জীবনের আদর্শ তিনি বহুলাংশে সফল করে তুলতে পারতেন। কিন্তু শাসক যে দেশে বিদেশী, আমলাতন্ত্র যেখানে বিরূপ, সেখানে আপ্রাণ প্রচেষ্টা যেন ভস্মে ঘি ঢালা।

সেই সঙ্গে আশুতোষ এটাও বুঝেছিলেন যে শিক্ষার ক্ষেত্রে বয়কট বা অসহযোগ, রাজনীতির বিকল্প হতে পারেনা। স্কুল-কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে আসা অনেকটা নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করার মতন। পরাধীন দেশেই শিক্ষার সমধিক দরকার।

তবে এটা সত্য যে অন্য পথে বিফল মনোরথ হয়েছিলেন বলেই আশুতোষ রাজনীতির পথ ধরবেন বলে মনস্থ করেছিলেন এবং তাও অন্যদের অনুরোধ উপরোধে। তাঁকে প্ররোচনা দেবার কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন ছাত্রজীবনে তাঁর গৃহশিক্ষক এবং পরে ওড়িশার খ্যাতনামা নেতা মধুসূদন দাস। তিনিই বলেছিলেন শিক্ষাক্ষেত্রের নিভৃত শান্তি পরিহার করে তাঁকে বেরিয়ে আসতে হবে রাজনীতির যুদ্ধক্ষেত্রে। আরো অনেকে নিজ নিজ প্রকৃতির প্রবণতা অনুসারে নানারকম কারণ দিয়ে বলেছিলেন কেন আশুতোষের রাজনীতিতে যোগ দেওয়া উচিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্যর মাইকেল স্যাড্‌লার-এর কথা বলা যায়—তিনি আশুতোষকে লিখেছিলেন তাঁর নেতৃত্বের নির্দেশ পেলে দেশের ও দশের পক্ষে মঙ্গল।

সমগ্র জাতির স্বার্থে আশুতোষের রাজনীতিতে এমুহূর্তে যোগদান যে নিতান্ত জরুরী এমন কথা সে সময়ে এক বা একাধিক লোক যে বলেছিল এমন নয়—বহু লোকই বলেছিল। এই স্তূপীকৃত দাবীতে ইন্ধন জোগাল অপরিণামদর্শী লীটন্‌-এর অশিষ্টতা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও আশুতোষ রাজনীতিক ক্ষেত্রে একত্র যুক্ত হয়ে সংগ্রামে নাববেন—অকস্মাৎ সেই সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

Life and Times of C. R. Das গ্রন্থে দেশবন্ধুর জীবনীকার লিখেছেন, "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা হরণের অপচেষ্টা ব্যাহত করার জন্য এবার স্যর আশুতোষ ও চিত্তরঞ্জন একযোগে কাজ করবেন স্থির করলেন।

"স্যর আশুতোষের সমর্থন পাবেন এবং হাইকোর্ট থেকে অবসর গ্রহণের

পর তিনি স্বরাজ্য পার্টির কাজ করবেন—এই প্রতিশ্রুতি লাভ করে নূতন পার্টির নেতা হিসাবে চিত্তরঞ্জনের শক্তি দ্বিগুণিত হবে সেই সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।" প্রতিশ্রুতি আশুতোষ ঠিকই দিয়েছিলেন। তাঁরা দুজনে যুক্তভাবে কাজ করতে পারলে পার্টির ক্ষমতা কতগুণে বৃদ্ধি পেত—এখন সেটা কেবল অনুমানের বিষয়।

একটা অনুমান সহজেই করা যায়—ভারতের রাজনীতিক পরিস্থিতিতে নিশ্চয় একটা গুণগত পরিবর্তনের স্মচনা হত। বাংলাদেশ—এমন কি ভারতও হয়তো খণ্ডিত হতনা। আমার Indian Independence in Perspective প্রবন্ধে আমি বলেছি যে প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের মারাত্মক ভুলটা হয়েছিল সাম্প্রদায়িকতার সমস্যাটিকে আঞ্চলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ না রেখে, তাকে সর্বভারতীয় সমস্যারূপে মেনে নেওয়া। চিত্তরঞ্জন সর্বদা চাইতেন সাম্প্রদায়িকতাকে সর্বভারতীয় বলে স্বীকার না করতে। আইনে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন বলে এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে তাঁর অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল বলে, আশুতোষ নিশ্চয় এ বিষয়ে চিত্তরঞ্জনের পাশে এসে দাঁড়াতেন।

হাইকোর্ট থেকে আশুতোষ অবসর নিলেন ১৯২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে। অতঃপর তিনি পাটনা গিয়েছিলেন ডুমরাও রাজ মামলা সম্পর্কে। সেখানে হঠাৎ ১৯২৪ সালের ২৫ মে তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে চিত্তরঞ্জনও দার্জিলিং-এ পরলোক গমন করেন। পর পর এই দুটি মৃত্যুতে ভারতের ভবিষ্যৎ যেভাবে বিপর্যস্ত হয়, তেমন বিপর্যয় ইতিপূর্বে ঘটেছে কিনা সন্দেহ। রাজনীতিক ক্ষেত্রে উভয়ের সহযোগ স্বপ্নই থেকে যায়, সত্য হতে পারেনি। ইতিহাসের অসমাপ্ত অধ্যায় কী হতে পারত ঘটনাবলীর অন্তর্গত এই বিয়োগান্ত সম্ভাবনা নিয়ে আমরা কেবল কল্পনায় হা হুতাশ করতে পারি।

ষোড়শ অধ্যায়

শেষ কথা

যতদূর স্মরণ হয়, সম্ভবত কলকাতা ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীর চ্যাপ্‌মানই প্রথম বলেছিলেন, বাঙালীদের মধ্যে যাঁরা খাঁটি বাঙালী তাঁদের গড়ন তথাকথিত আর্যদের মতো একহারা লম্বাটে নয়, তাঁরা বেঁটেখাটো শক্তসমর্থ মানুষ। কথা বলার ভাবে চ্যাপ্‌মান বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বাঙালী মাথাওয়ালা লোক বলে, মাথাটাকে ধারণ করার জন্য দেহটা মজবুত হওয়া দরকার। কেমব্রিজ-এ থাকতে চ্যাপ্‌মান যখন তাঁর প্রবন্ধ লেখেন, তাঁর চোখের সামনে আশুতোষের চেহারাখানা নিশ্চয় ভাসছিল—অন্তত‌পক্ষে খাঁটি বাঙালীর বর্ণনার সঙ্গে আশুতোষের দেহের গঠন তো হুবহু মিলে যায়। তবে চ্যাপ্‌মানের কথাটা সকল বাঙালী সম্বন্ধে মোটামুটি প্রযোজ্য কিনা, তা নিশ্চয় করে বলা যায়না।

তিনি যে ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান এবং ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিপূর্ণ উত্তরাধিকার তাঁর মধ্যে যে বর্তেছে—এই নিয়ে আশুতোষ গভীর গৌরব বোধ করতেন। প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণদের মতো আশুতোষ দিনচর্যায় খুবই সাদাসিধে ছিলেন, শক্ত বিছানায় শোওয়া পছন্দ করতেন, বাড়িতে থাকলে পৈতে গলায় খালি গায়ে বৈঠকখানায় বসতে তাঁর কোনো সঙ্কোচ ছিল না। অপিস আদালত সেরে বাড়ি ফিরেই ধড়াচুড়ো ছেড়ে ধুতি পরতেন এবং সেই সঙ্গে খাটো ধরনের চায়না কোট। তাইতে সবচেয়ে আরাম পেতেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। সেদিক থেকে তিনি ছিলেন উনিশ শতকের রেনেশাঁস যুগের অন্যান্য

নেতৃস্থানীয় সম্ভ্রান্ত বাঙালীর মতোই। সে কালের বিদগ্ধ বাঙালীরা নিজেদের সংস্কৃতিতে স্থিতিবান হয়েও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ দান গ্রহণে তৎপর ছিলেন। ভারতের দুর্ভাগ্য বলতে হবে সম্ভবত তিনিই ছিলেন সে যুগের শেষ প্রতিনিধি।

বিধাতা তঁাকে বীরত্বের সমস্ত লক্ষণ দিয়ে যেন সৃষ্টি করেছিলেন। ভয়ডর বলতে তঁার কিছু ছিলনা, সেই জন্যই কোনো প্রকার দ্বিধা সংকোচ না করে আত্মপ্রত্যয়ে নির্ভরশীল হয়ে সোজা তিনি তঁার লক্ষ্য অভিমুখে চলতে পারতেন। এই কারণেই যাকিছু তিনি ধরতেন, তাইতেই কৃতকার্য হতেন। তঁার দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়কে অনেক নিন্দুক অহমিকা বলে বর্ণনা করতেন, বলতেন তঁার স্বভাবে চরিত্রে পরমত অসহিষ্ণু একনায়কত্বের লক্ষণ ছিল। পিছন ফিরে তাকিয়ে আমার মনে হয় এই সমস্ত দোষত্রুটিই আসলে ছিল তঁার গুণ, যদি পদে পদে পাঁচজনের মতামতের অপেক্ষা রেখে তঁাকে চলতে হত তাহলে তঁার অনতিদীর্ঘ কর্মজীবনের মধ্যে তিনি এতখানি করে যেতে পারতেন বলে মনে হয় না।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা দরকার, আশুতোষ গভীরভাবে মাতৃভক্ত ছিলেন এবং মায়ের আদেশ ও অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দিতেন না। শোনা যায় সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড যখন সম্রাট পদে অভিষিক্ত হন, তখন তঁার অভিষেক অনুষ্ঠানে ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী কলকাতার প্রতিনিধিরূপে যোগদানের জন্য, ভারতের ভাইসরয় লর্ড কার্জন আশুতোষকে লণ্ডনে যাবার জন্য বলেছিলেন। সম্রাটের অভিষেকে উপস্থিত হবার আমন্ত্রণ যে কোনো রাজভক্ত প্রজার পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে খুবই শ্লাঘার বিষয়। আশুতোষ কিন্তু ভাইসরয়কে জানিয়ে দেন যে, ছেলে 'কালাপানি' পেরোবে এমনটা তঁার মায়ের ইচ্ছা নয় বলে, তিনি বিলেত যেতে অপরাগ। যাঁর মারফত খবরটা পাঠিয়েছিলেন লর্ড কার্জন তঁাকে নাকি বলেন, "ফিরে গিয়ে আশুতোষকে বলো যে ভারতের

ভাইসরয় ও গবর্নর জেনারেল-এর আদেশ যে তাঁকে যেতে হবে।” সঙ্গে সঙ্গে আশুতোষ প্রত্যুত্তর পাঠালেন : “তাহলে ভারতের ভাইসরয়কে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মায়ের হয়ে আমাকে বলতেই হয় যে তিনি চাননা যে তিনি থাকতে তাঁর ছেলে আর কারো আদেশ মেনে চলবে।” জবাবটা হয়েছিল আশুতোষের মায়েরই উপযুক্ত—তিনি খুবই তেজস্বিনী মহিলা ছিলেন, তাঁর মতামতও ছিল তাঁর প্রখর ব্যাক্তিত্বের পরিচায়ক।

তাই বলে আশুতোষ সামাজিক ব্যাপারে গোঁড়া ও প্রাচীনপন্থী ছিলেন মনে করলে ভুল মনে করা হবে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জনৈক ভক্ত হিসাবে তিনি মুখবুজে সমাজের অনাচার অত্যাচার মেনে নেবার পক্ষপাতি ছিলেন না। আশুতোষের কন্যা কমলা ছিলেন বালবিধবা, তাঁকে দেখে পিতার প্রাণ কাঁদত। সমাজের নিন্দা ও আপত্তি এক প্রকার উপেক্ষা করেই, কেবলমাত্র তাঁর মায়ের সমর্থনের জোরে, তিনি ১৯০৮ সালে বিধবা কন্যার বিবাহ দেন। দুর্ভাগ্য বলতে হবে কমলার দ্বিতীয় স্বামী বিবাহের অল্পদিন পরে মারা যায়। তাঁর নিজের মৃত্যুর এক বছর আগে ১৯২৩ সালে কমলারও মৃত্যু ঘটে। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন তাঁর বৈধব্যদশা দেখে আশুতোষের দুঃখের অবধি ছিল না। কমলার স্মরণেই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কমলা বক্তৃতামালার জন্য স্থায়ী অর্থব্যবস্থা করেন।

কমলা বক্তৃতামালার প্রথম বক্তা ছিলেন মিসেস অ্যানি বেশান্ত। ১৯২৫ সালে যখন তিনি বক্তৃতা দেন আশুতোষ তখন আর ইহ জগতে নেই।

জ্ঞানবিজ্ঞানে প্রতিশ্রুতিবান মেধাবী কর্মীদের সম্বন্ধে আশুতোষ খুবই আগ্রহী ছিলেন—তাঁদের প্রতি তাঁর গভীর দরদ ছিল এবং উপদেশ নির্দেশ দিয়ে সর্বদা তিনি তাদের প্রোৎসাহিত করতেন। জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি দেশ-বিদেশের মধ্যে কোনো পার্থক্য করতেন না। তাঁর সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে প্রফেসর কালিস্ Nature পত্রিকায় বলেছিলেন :

"জ্ঞানবিজ্ঞানে নিষ্ঠাবান সকল কর্মী—তা তাঁরা অখ্যাত হন বা খ্যাতনামা হন--তাঁকে পেয়েছেন প্রাজ্ঞ ও সমঝদার বন্ধুরূপে ; তাঁর সঙ্গে কথা বলা যেত যেমন সমানে সমানে সহযোগীর সঙ্গে কথা বলা যায়। সাহিত্য কিম্বা বিজ্ঞানের নানা শাখা-প্রশাখায় যাঁরা সুপণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে লক্ষ্য করতেন যে আশুতোষ সেই সব বিষয়ে আধুনিকতম রচনা বিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। সত্য এবং জ্ঞানের আলোর সন্ধানী সকল লোককেই তিনি নিঃস্বার্থভাবে ও অকৃপণভাবে সাহায্য দিতেন, উৎসাহ দিতেন। বিদ্বৎসমাজে তাঁর স্থান ছিল বিশিষ্ট, তিনি সহজেই সকলকে ছাপিয়ে যেতে পারতেন। গুণগ্রাহী ছিলেন বলে প্রশংসনীয়কে প্রশংসা করার বেলা তিনি যেমন অকুণ্ঠ ছিলেন, তেমনি প্রয়োজন বোধে উপদেশ নির্দেশ দিতেও দ্বিধা করতেন না।"

গ্রীক পুরাণে বীরশ্রেষ্ঠ অন্টিয়ুসের উপাখ্যানে বলা হয়েছে যে জননী বসুন্ধরা থেকে বিচ্যুত না হওয়া পর্যন্ত কেউ তাঁকে পরাজিত করতে পারত না। এই আখ্যানের প্রতীকী ব্যঞ্জনা তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠে যখন লক্ষ্য করি বিশ্বের সর্বত্র তরুণ সমাজ আজ অস্থির হয়ে উঠেছে। মূল্যবোধের ভিত্তি থেকে তাদের পা সরে গেছে বলে তারা সব কিছুতে আস্থা হারিয়ে বিশ্বনিন্দায় মুখর হয়েছে ও আত্মহননের উন্মত্ততায় নিজেদের রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থাকেই আঘাত করার জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছে।

আশুতোষ তরুণ সমাজের অন্তরঙ্গ ছিলেন বলে তাদের প্রকৃত সমস্যা বুঝতে পারতেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে তিনি তরুণ সমাজকে উদ্দেশ্য করে যা বলেছিলেন, আজকের দিনে তা পড়লে মনে হয় অনাগত দুঃসময়ের ছায়া তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। সেইজন্য তাঁর সেই উক্তি আজকের দিনেও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আশুতোষ বলেছিলেন: "ভারতের চিন্তাজগতে মহত্তম যাকিছু আমরা উত্তরাধিকার স্বরূপ পেয়েছি, তা উপেক্ষা কোরো না। ভারতের আচার-ব্যবহারে যা ভালো তাকে

পরিহার কোরো না। যে অমূল্য সম্পদ পুরুষানুক্রমে তোমাদের অধিকারে এসেছে, পশ্চিমের চোখ-ধাঁধানো আলোয় অন্ধ হয়ে সেদিকে দৃষ্টি না দেওয়া মারাত্মক ভুল। পশ্চিমী সভ্যতা ও সংস্কৃতির যাকিছু শ্রেষ্ঠ তার সম্বন্ধে শ্রদ্ধা বা অনুরাগ রক্ষা করেও, তোমরা যেন তোমাদের স্বাজাত্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা বা অনুরাগ অক্ষুণ্ণ রাখতে পারো। তোমরা যে খাঁটি ও ষোলো আনা ভারতীয় সেকথা মানতে কখনো যেন দ্বিধা কোরো না। পোশাক-পরিচ্ছদ ও রুচি পছন্দের নিতান্ত নগণ্য শৌখিনতা যেন তোমাদের জাতীয়তাবোধকে ছাপিয়ে না উঠে। সর্বোপরি নিজের নিজের মাতৃভাষার চর্চা করে যাও সযত্ন অনুশীলনে, জেনে রেখো দেশের লোকের মনের নাগাল যদি পেতে চাও তাহলে স্বদেশী ভাষা ছাড়া গতি নেই। পশ্চিমী জ্ঞানের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার থেকে কিছু যদি দেশের জন্য আহরণ করতে চাও— তবে তারও একমাত্র উপায় হল দেশের ভাষা।"

তরুণের বিদ্রোহ প্রশমনে আশুতোষের এই সাবধান বাণীকে কেউ কেউ হয়তো বলবেন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। কিন্তু স্বল্পমেয়াদী কোনো ব্যবস্থায় একটি দীর্ঘমেয়াদী সমস্যার নিরসন হতে পারে বলে তো আমার মনে হয় না। এ বিদ্রোহ বহুকালের পুঞ্জীভূত ঘৃণা ও হতাশার প্রকাশ। ধৈর্য ও দূরদৃষ্টি ব্যতিরেকে এ সমস্যা মেটবার নয়।

আশুতোষ যে বলেছেন মুক্তির একমাত্র উপায় হল দেশের লোকের মধ্যে সত্যকার দেশাত্মবোধের সঞ্চার—এ নিয়ে কোনো দ্বিমত হতে পারে না। ষোলো আনা ভারতীয় হতে হবে, তথাকথিত আধুনিকতার নকল-নবিশ হলে চলবে না। খাঁটিতে ভেজালে যে তফাৎ, আসলে নকলে তফাতও ততখানি।

আশুতোষের দেশাত্মবোধ ছিল সর্বোচ্চ স্তরের। তরুণ সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর এই বাণীতে তিনি যেন সারা দেশকে ডাক দিয়ে বলে গেছেন দেশপ্রেম কেমন জিনিস, দেশকে কীভাবে ভালোবাসতে হয়।

পরিশিষ্ট—ক

১৯২২ সালের ১৮ মার্চ তারিখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণ

সূচনাতেই মহামান্য চ্যান্সেলর মহোদয়কে আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই যে তিনি আমার শিক্ষা-জননী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার দীর্ঘকালব্যাপী সম্পর্কের কথা এমন সুন্দরভাবে বলেছেন। নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে একটি শতাব্দীর তিন ভাগেরও অধিক কাল ধরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার অব্যাহত সম্বন্ধ। কিন্তু সর্বাগ্রে আমার এবং এই বিদ্বজ্জনসমাগমের সকল ব্যক্তির মনে যে প্রসঙ্গ উদয় হচ্ছে তাহল এই যে, এই প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠনের কঠিন কাজে আমরা আপনার মতো সুপণ্ডিত ও প্রশাসননিপুণ একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রাজ্ঞ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পরিচালনার সুযোগ থেকে অচিরে বঞ্চিত হব। এজন্য আমরা মর্মান্তিকভাবে দুঃখিত। সেই দুঃখ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সশ্রদ্ধ বিনয়ে একটি আশাও প্রকট করছি। আপনার ভবিষ্যৎ সমক্ষেত্র যতই মহৎ ও বৃহৎ হোক না কেন, আপনি যেন সমান আগ্রহ ও সহানুভূতির সঙ্গে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ বিবর্তনের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখেন।

বার্ষিক সমাবর্তন সভায় অভিজ্ঞানপত্র বিতরণের অবসরে এই প্রতিষ্ঠানের প্রথা অনুসারে উপাচার্য পূর্ববর্তী বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যাবলী পুনরীক্ষণ করে থাকেন। আমি যদি প্রথাসিদ্ধ এই পন্থা পরিহার করে, আজকের দিনে শিক্ষার যেসব সমস্যার মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়েছি, একটু বিস্তৃততর পরিপ্রেক্ষিতে তার আলোচনা করি—আশা করি আপনার প্রসন্ন প্রশ্রয় থেকে বঞ্চিত হব না।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং পর্বে পর্বে এর বিকাশের ক্রম

অনুধাবন করলে একটি যে আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়, তাহলে এই যে এ সমস্তই ঘটেছে এ দেশের রাজনীতিক অবস্থার সংকটকালে। সিপাহী বিদ্রোহের আগুন নিভে যাবার আগে যখন ধিকি ধিকি জ্বলছে, সেই সময় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন হল। শিক্ষার প্রসার ও উন্নতির কথা যখন চিন্তা করাও শক্ত ছিল, সেই সময় কতিপয় সুদক্ষ প্রশাসনবিদ অদম্য অধ্যবসায় ও চিত্তের ঔদার্য নিয়ে একাজে নেমেছিলেন বলে অসম্ভব সম্ভব হল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল কেবলমাত্র পরীক্ষা গ্রহণের প্রতিষ্ঠানরূপে। কয়েক বছর যেতে না যেতেই এই বিশ্ববিদালয়ের অন্যতম মেধাবী স্নাতক স্বর্গত আনন্দমোহন বসুর নেতৃত্বে অনিবার্যভাবে একটি আন্দোলন গড়ে উঠল এই প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য। সরকারের কাছে এ নিয়ে আবেদন নিবেদন উপস্থাপিত হলে পর সরকার তা সঙ্গে সঙ্গে নামঞ্জুর করে বলেন যে উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, নূতন প্রস্তাব তার পরিপন্থী। ইতিহাসে দেখা যায় আপাতদৃষ্টিতে আত্মবিরোধী প্রস্তাবও আখেরে স্বতঃসিদ্ধ বলে স্বীকৃত হয়েছে। ১৯০৪ সালে ইণ্ডিয়ান য়ুনিভার্সিটিজ্ অ্যাক্ট আইনের মর্যাদা লাভ করার পর স্থির হয় যে ভারতের তাবৎ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণার উন্নতিকল্পে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকার থাকবে ছাত্রদের বিদ্যাদানের জন্য প্রফেসর, লেকচারার নিয়োগ করার এবং লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি ও ম্যুজিয়ম পত্তন করে সেগুলিকে যথাপ্রয়োজন সম্ভারে সজ্জিত করে রক্ষা করার। বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন চ্যান্সেলর লর্ড কার্জন যে সকল সংগঠনের কাজে হাত দিয়েছিলেন তার মধ্যে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কারের উদ্দেশ্যে এই আইন প্রণয়ন নিঃসন্দেহে অন্যতম মুখ্য কাজ।

আজ থেকে ষোলো বছর আগে, লর্ড মিণ্টো একদিন আমায় ডেকে একটি কাজের ভার নিতে বলেন। আমার জীবনে সে দিনটি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, কারণ তিনি আমায় যে কাজের ভার দেন সেই কাজই কালে

বিশ্ববিদ্যালয় পুনঃসংগঠনের বিরাট কাজে পরিণত হয়। সে সময়টা ছিল রাজনৈতিক উত্তেজনার যুগ—যেমন ছিল তার বিস্তার তেমনি ছিল তীব্রতা। দেশের প্রত্যন্ত প্রদেশেও তখন প্রবল উত্তেজনা। এই অস্বাভাবিক ও বিভ্রান্তকর পরিবেশে শিক্ষার সংস্কার কার্যে হাত লাগানো যে কী পরিমাণ শক্ত হয়েছিল, সেকথাও আমার স্মরণে আছে। কিন্তু সংস্কারের কাজ এগিয়ে গিয়েছিল অপ্রতিহত গতিতে এবং একাদিক্রমে দীর্ঘ আট বৎসর ধরে কাজ করার পর আমি যখন ভাইস চ্যান্সেলর-এর পদ থেকে সরে দাঁড়াই, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তদানীন্তন রাজধানী এই কলকাতায় শিক্ষণ ও গবেষণার মহাবিদ্যালয়রূপে এই প্রতিষ্ঠান শেষ পর্যন্ত দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তখন আমি ঘুণাক্ষরে ভাবতে পারিনি যে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে নূতন করে গড়ে তোলার ক্রমবর্ধমান শক্ত কাজে হাত দেবার জন্য পুনরায় আমার ডাক পড়তে পারে। লর্ড হার্ডিঞ্জের মতো একজন দূরদর্শী রাষ্ট্রশাসকও যে এই সম্ভাবনার কথা ভাবতে পারেন নি তার প্রমাণ হল এই যে তিনি দুঃখপ্রকাশ করে আমায় চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে ভাইস চ্যান্সেলর হিসাবে আমার শেষ ভাষণ যে সমাবর্তনে দেবার কথা, সেই সভায় তিনি উপস্থিত থাকতে পারবেন না। কিন্তু মানুষ ভাবে এক ঈশ্বর করেন আর। আমার জীবনের অত্যাশ্চর্য ঘটনার অন্যতম হয়ে এক বছর আগে আপনার সকাশে উপস্থিত হবার জন্য আমার আমন্ত্রণ এল। সেই সাক্ষাতকারের সময় আপনি সমধিক আন্তরিকতা ও অনুগ্রহ সহকারে আমায় জানালেন যে আমাদের তদানীন্তন চ্যান্সেলর লর্ড চেমস্‌ফোর্ড এবং তদানীন্তন রেক্টর হিসাবে মহামান্য আপনি স্বয়ং আপনাদের উভয়ের ইচ্ছে, আমি যেন পুনরায় ভাইস চ্যান্সেলর পদের দায়িত্ব গ্রহণ করি। এমত-অবস্থায় দায়িত্ব স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না—যদিচ আমি ভালো করেই জানতাম যে আপনাদের এই আমন্ত্রণ কোনো হীরকখচিত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার আমন্ত্রণ নয়। পরিস্থিতির দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সংকট বিষয়ে

আমি যতটা সচেতন ছিলাম তেমন হয়তো অপর কেউ ছিল না। অন্তরে অন্তরে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে গত সাত বছরে শিক্ষার ক্ষেত্রে যেসব মূলগত সংস্কারের সূত্রপাত হয়েছে, তার জের টেনে চলতে হলে আমাদের যাত্রা করতে হবে ঝড়-তুফানের মধ্য দিয়ে।

আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে ১৯১৬ সালে লর্ড চেমসফোর্ড একটি উপদেষ্টা সমিতি গঠন করে বলেন, তাঁরা যেন স্নাতকোত্তর শিক্ষণ-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য সুচিন্তিত প্রস্তাবাদি ভারত সরকারের গোচরীভূত করেন। আমাকে এই সমিতির সভাপতি নিযুক্ত করা হয়; সদস্যদের মধ্যে ছিলেন প্রফেসর প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রফেসর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, প্রফেসর হ্যামিল্‌টন, প্রফেসর হাওয়েল্‌স, ডক্‌টর হেনরি হেডন, মিষ্টার হর্নেল, মিষ্টার এন্‌ডারসন ও মিষ্টার ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ-এর মতো প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ও প্রশাসনবিদ্। তাঁরা সকলে সর্বসম্মতিক্রমে পুনর্গঠনের একটি বিশদ পরিকল্পনা দাখিল করেন। ভারত সরকারের মন্ত্রকমণ্ডলীতে তখন ছিলেন স্যর শংকরণ নায়ার—উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাম্য ও স্বাধীনতা রক্ষায় দুর্ধর্ষ সংগ্রামী। প্রধানত তাঁর মধ্যস্থতাতেই ভারত সরকার সেই পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন রেক্টর লর্ড কারমাইকেল-এর সুবিচার ও বহুদর্শনজনিত অভিজ্ঞতার বিশেষ গুরুত্ব আছে—তিনিও সর্বতোভাবে আমাদের সুপারিশের পক্ষে রায় দিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট দীর্ঘ বিতর্কের পর কেবল যে আমাদের প্রতিবেদনের অন্তর্গত মূলনীতিগুলি গ্রহণ করলেন এমন নয়, অপিচ অবিলম্বে সেই সকল নীতি কার্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে নিয়মতন্ত্রও রচনা করলেন। এইখানে অতীব সন্তোষের সঙ্গে আমার স্বীকার করা উচিত যে মাননীয় মহোদয় রেক্টর পদ গ্রহণ করার পর খোলা মন নিয়ে সমস্যাটুকু বুঝতে চেয়েছিলেন এবং পরনির্ভর না হয়ে সমস্ত ব্যাপার পরীক্ষার অন্তে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে সেনেট প্রস্তাবিত নূতন পরিকল্পনা নীতিগতভাবে ত্রুটিবিহীন

এবং সমর্থনের যোগ্য। ফলে ১৯১৭ সালের ২৬ জুন তারিখে কলা ও বিজ্ঞানের সকল বিভাগে স্নাতকোত্তর শিক্ষা সংক্রান্ত নিয়মাবলী ভারত সরকার মঞ্জুর করেন।

কলকাতার একটি শিক্ষণ ও গবেষণার মহাবিদ্যালয় স্থাপনে এইভাবে একটি নূতন পর্ব শুধু নয়, নূতন যুগের সূত্রপাত হয়। আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য এই নূতন পদক্ষেপ করতে গিয়ে, আমাদের কত যে কষ্ট স্বীকার করতে হয়, মতান্তর ও মনান্তরের কত তিক্ততা সহ্য করতে হয়—সেসব কথা মনে করিয়ে দেবার এটা ক্ষেত্র নয়। তেমন করতে যাওয়াটা বরং অবাঞ্ছিত ও অ-বিজ্ঞজনোচিতই হবে। তবে একটা কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন—এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে বহু বিতর্কের পর এই সুচিন্তিত পূর্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, পর পর দু'দুজন রেক্টর সেই সিদ্ধান্তের অনুকূলে রায় দিয়েছেন এবং সমস্ত ব্যাপারটা পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের পর চূড়ান্তভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সরকার। অপর একটি ঘটনা যা আমাদের দৃষ্টিপাত ও মনোযোগের অপেক্ষা রাখে সে হল বিশ্ববিদ্যালয় ও তাঁর আয়ত্বের অন্তর্গত কলেজগুলির নিকট সহযোগের নীতি। বাংলার উচ্চমেধাসম্পন্ন তরুণ ছাত্রেরা সর্বোচ্চ মানের শিক্ষার সুযোগ পেতে হলে যে শিক্ষণ ও গবেষণার কেন্দ্ররূপে বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার অন্তর্গত কলেজগুলির প্রয়াস ও প্রচেষ্টা একত্র সমন্বিত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন—এই সত্যটুকু য়ুনিভার্সিটি কমিশনও স্বীকার করে নিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষণ ও গবেষণার কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলার প্রথম ধাপেই দুরদৃষ্ট এসে আমাদের বিপর্যস্ত করার আয়োজন করেছিল, সে কথা ইতিপূর্বে বলেছি। দুর্যোগ যখন কেটে গেল বলে ধারণা হয়েছিল, আবার অবিচল পদক্ষেপে দুরদৃষ্ট আমাদের অনুসরণ করতে প্রবৃত্ত হল। পরীক্ষা নিয়ে বিপর্যয় ঘটে যাবার অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের ভূতপূর্ব আয়ত্বাধীন

অঞ্চলে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সৃষ্ট হবার ফলে, আমাদের কর্মক্ষেত্র যেমন সংকুচিত হয়ে গেল তেমনি অর্থাগমের অনেক পথই গেল রুদ্ধ হয়ে। এইসব ঘটনা একের পর এক ঘটতে লাগল ঠিক যে সময়ে পুনর্গঠনের দায়িত্ব অনিবার্যভাবে বাড়তে লেগেছে। ঠিক সেই সময়েই বর্তমান কালের মহাযুদ্ধ (যার শান্তি ঘটল মাত্র সেদিন) এসে আমাদের সযত্নে রচিত হিসাবের সমস্ত অঙ্ক দিল তছনছ করে। সভ্য জগতের কত দৃঢ়প্রতিষ্ঠ রাষ্ট্রের অর্থব্যবস্থা টলমল করে উঠেছিল মহাযুদ্ধের ফলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পুনর্গঠন করতে গিয়ে, আমাদের স্বল্পায়তন রাজ্যেও যদি আয় ব্যয়ের সমতা রক্ষা করা সম্ভব না হয়ে থাকে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। দুর্দশা চরমে উঠল যখন রাজনীতিক উত্তেজনার একটা প্রবল জোয়ার এসে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল ছাত্রদের তরুণ মনে। নিয়ম সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হল, প্রতিষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলার ব্যবস্থায় তাদের আস্থার ভিত্তি গেল শিথিল হয়ে এবং শিক্ষণ পঠনের শান্তিময় পরিবেশে প্রবেশ করল ঝড়ের তাণ্ডব। বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনের এই সংকটকালে পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণের দায়িত্ব বহন করা যে কীরকম দুঃসাহসিক কাজ—সে তো সহজেই অনুমেয়। কিন্তু কৃত্য যত কঠিন হয় কর্তব্য সাধন ঠিক সেই পরিমাণে আকর্ষণীয় হয়ে উঠে—তার প্রমাণ আমরা দিয়েছি আমাদের দায়িত্ব পালনের চেষ্টায়। ইতিহাসের ঘটনায় যাঁরা দার্শনিক-তত্ত্ব সন্ধান করে থাকেন, তাঁদের মতে এই প্রকার বিশ্ববিপর্যয়ের মধ্য দিয়েই আসে সভ্যতার বিবর্তনে নূতন অধ্যায়। তারই প্রমাণস্বরূপ আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করছি আমাদের চারিদিকে নূতন প্রাণের স্পন্দন। নূতন আশা ভরসার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে মানুষের কর্মজগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। প্রগতির পথে মানুষের এই সংগ্রামে, আমাদের দেশও আত্মসম্মানে বলীয়ান হয়ে তার আপন জায়গাটুকু যেন নিতে পারে। ভারতের ভাগ্যবিধাতা প্রসন্ন হন যদি ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সন্তানদের জন্য

সর্বোচ্চমানের শিক্ষা সুপ্রচুর ভাবে দান করার ব্যবস্থা হয়। বিদ্যাদানের এই মহৎ কাজে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের পুরোধারূপে আশা করা যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই অগ্রণী হয়ে পথ দেখাবে। এই প্রগতিশীল প্রদেশের প্রত্যেকটি নাগরিককে আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই তাঁরা যেন শিক্ষণ ও গবেষণার কেন্দ্ররূপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবর্তনের ইতিহাস ও তার বর্তমান অবস্থা সযত্নে অনুধাবন করে দেখেন। তাহলে আমাদের জাতীয় প্রগতির সহায়করূপে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শক্তি বা মূল্য কতখানি, সেটা তাঁরা পক্ষপাতশূন্য হয়ে বিচার করতে পারবেন। এই অবসরে আপনাদের কাছে সংক্ষেপে নিবেদন করতে চাই বিশ্ববিদ্যালয়ে কী কী আয়োজন করা হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের নিতান্ত সামান্য প্রচেষ্টা কতোখানি সাফল্য অর্জন করেছে। এ থেকে আপনারা বিচার করতে পারবেন আমরা কি সেই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছি যা নাকি একদিন বাংলা তথা ভারতের গৌরবের বস্তু বলে গণ্য হতে পারবে। এখন কিঞ্চিৎ ধৈর্য ধরে অবধান করুন।

নূতন নিয়মতন্ত্র অনুসারে কলা ও বিজ্ঞান শাখায় বিশ্ববিদ্যালয়কে স্নাতকোত্তর স্তরের অধ্যাপনা গবেষণার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে জ্ঞানবিজ্ঞানের কুড়িটি বিভাগে কাজের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। সেই কুড়িটি বিভাগ হল ইংরাজী, সংস্কৃত, পালি, আরবী, পার্শিয়ান, ভারতীয় ভাষাসমূহ, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, দর্শন, ইতিহাস, অর্থবিদ্যা, বাণিজ্য বিদ্যা, তাত্ত্বিক গণিত, ফলিত গণিত, পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন, শারীরবৃত্ত, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, মনোবিদ্যা এবং নৃবিদ্যা। যাঁরা মনে করেন প্রগতির পথে দ্রুত পদক্ষেপে যে জাতি অগ্রসর হয়ে চলেছে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা প্রশস্ত করা দরকার, তাঁরাও হয়তো জ্ঞানবিজ্ঞানের এতগুলি শাখার তালিকা শুনে আতঙ্কিত বোধ করতে পারেন। পক্ষান্তরে যাঁরা পাশ্চাত্ত্য দেশের উচ্চতর বিদ্যার মহাকেন্দ্রগুলির

কার্যাবলী সংক্রান্ত খবরাখবর রাখেন, এবং সেইসব কেন্দ্রে সম্প্রতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্র কীরকম আশ্চর্যভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল, তাঁরা হয়তো বলবেন আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিধি এতটা সংকীর্ণ না হলেই হত ভালো। প্রগতিশীল সমাজের চাহিদা মেটাবার দায়িত্ব নিয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে এইসব বিষয়ে শিক্ষাদানের উপযুক্ত পরিমাণ ব্যবস্থা রাখা যে কত প্রয়োজন সে বিষয়ে বেশি করে বলতে যাওয়া হয়তো বাহুল্য হবে। কিন্তু যেসব বিভাগে ছাত্রসংখ্যা স্বভাবতই কম সেইসব বিভাগ নিয়ে সমালোচকেরা অনুযোগ করে বলেছেন এইসব বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করাটা মূর্খামির চূড়ান্ত হয়েছে। কথাটা বিশদ করার জন্য, দৃষ্টান্তস্বরূপ শিক্ষার এইরকম এমনি একটা শাখার কথা ধরা যাক যা প্রত্যেক ভারতীয়ের স্নেহপ্রশ্রয় লাভের উপযুক্ত। এক্ষেত্রে আমরা না হয় সংস্কৃত শিক্ষার বিভাগটাই ধরলাম। গত বছরের সমাবর্তনে মাননীয় মহোদয় এই বিভাগ সম্বন্ধে যে উল্লেখযোগ্য কথা বলেছিলেন, তা থেকে এখানে উদ্ধৃতি না দিয়ে পারলাম না: "ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধার যে অর্ঘ নিবেদনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয়েছে, তা নিয়ে আমরা সকলেই গর্ব ও আনন্দ অনুভব করতে পারি। স্নাতকোত্তর সংস্কৃত বিভাগে ভারতীয় জ্ঞানের সমৃদ্ধ সম্ভার নিয়ে সুযোগ্য পণ্ডিতেরা পঠন-পাঠন ও গবেষণায় রত আছেন, অর্থাৎ প্রকারান্তরে তাঁরা ভারতীয় বিদ্যারই একটি প্রশস্ত ক্ষেত্র নিয়ে কাজ করে চলেছেন।" মহাশয়ের এই উক্তি থেকে বুঝতে পারি মহাশয় সংস্কৃত বিভাগের পূর্ণ তাৎপর্যটুকু ঠিকই ধরেছেন। মহাশয়ের এই প্রশংসা বাক্যের বিপরীত প্রান্তে রয়েছেন কিছু আত্মদেশীয় সমালোচক, পশ্চিমের চোখধাঁধানো আলোয় যাঁদের চোখ ঝলসে গেছে যাঁরা প্রাচ্যের গৌরবময় ঐতিহ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সংস্কৃত বিভাগ সংক্রান্ত নিয়মাবলী একবার পাঠ করে দেখলে, যিনি কেবল ভাসা ভাসা ভাবে বুঝতে চান তিনিও দেখবেন এই বিভাগের শিক্ষনীয় বিষয় নয়টি প্রশাখায় বিভক্ত। এই

প্রশাখাগুলি হল: সাহিত্য, বেদ, বেদান্ত, সাংখ্য ও যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক, দর্শন, প্রাকৃত ও প্রাচীন লিপি বিদ্যা, এবং ব্যবহারশাস্ত্র ও মীমাংসা। ইতিপূর্বে আমি যেমন বলেছি, 'সংস্কৃত' কথাটা চার অক্ষরের কথা হলে কী হয়, জ্ঞানের ক্ষেত্র হিসাবে সংস্কৃত একটি সাম্রাজ্য বিশেষ। কিঞ্চিৎ সীমিতভাবে হলেও পালি বিভাগ সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। মাননীয় মহোদয় যথার্থই বলেছেন এই বিভাগের অধিকার "সুদূর প্রসারী বৌদ্ধ জ্ঞানের রাজ্য" অবধি বিস্তৃত। এই বিভাগও চারটি প্রশাখায়—সাহিত্য, দর্শন, প্রাচীন লিপি ও মহাযান—নিয়ে বিবৃত। ঐস্লামিক বিদ্যাও যে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেনি এমন নয়—এই বিভাগের প্রশাখার মধ্যে আছে ঈশ্বরতত্ত্ব, দর্শন, সাহিত্য, অলংকারশাস্ত্র, কাব্যালোচনা, ব্যাকরণ ও বিজ্ঞান।

তিব্বতী বিদ্যার প্রসার কল্পে বিশ্ববিদ্যালয় যে ব্যবস্থা করেছেন, সে বিষয়ে কিছু না বলা সংগত হয় না। খ্রীষ্টিয় অব্দের প্রথম এক হাজার বছরে, ভারত সভ্যতার ইতিহাসের লুপ্ত সূত্রগুলি পুনর্গ্রথিত করতে হলে তিব্বতী বিদ্যা আয়ত্ত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এক কলকাতা ছাড়া ভারতের আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো তিব্বতী পঠন-পাঠনের নিয়মিত ব্যবস্থা করে উঠা সম্ভবপর হয়নি। প্রখ্যাত পণ্ডিতেরা বারম্বার বলেছেন খ্রীষ্টাব্দের প্রথম হাজার বছর ছিল ভারত ইতিহাসের অন্ধকারময় যুগ। সেই যুগে হাজারে হাজারে সংস্কৃত পুঁথি ভারতীয় পণ্ডিতেরা পর্বত বেষ্টিত তিব্বতে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন, ভারতীয় বিদ্যা সংরক্ষণের জন্য। সেইসব পুঁথি সংস্কৃতজ্ঞ লামারা প্রচুর নিষ্ঠাসহকারে অনুবাদ করে রেখেছিলেন। ভারতীয় বিদ্যার স্মৃতিচিহ্নরূপে সেইসব অনুবাদ এখনো তিব্বতে সংরক্ষিত—যদিচ মূল সংস্কৃত গ্রন্থগুলি তাদের জন্মভূমি ভারত থেকে এক প্রকার নিশ্চিহ্ন। আমাদের পণ্ডিত সমাজ থেকে কেবল দুজন ব্যক্তি—শরৎচন্দ্র দাস ও সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—এই লুপ্ত বিদ্যা আহরণের উদ্দেশ্যে তিব্বতের অভ্যন্তরে

অভিযান চালিয়েছিলেন। অতি সামান্যভাবে হলেও তিব্বতী বিদ্যার এই ক্ষেত্রটুকু প্রস্তুত করতে বেগ পেতে হয়েছিল প্রচুর। সিকিমের পোলিটিকেল অফিসর মেজর ক্যাম্পবেল্ ছিলেন স্বয়ং একজন তিব্বতী বিদ্যার বিশারদ। তাঁর মধ্যস্থতায়, দালাই লামা তিব্বতের পণ্ডিতপ্রবর গেশে লোবজাং তারজে-কে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকরূপে পাঠাতে স্বীকৃত হন। কিন্তু সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের শোচনীয় মৃত্যুর পর, গেশে-কে কিছুতেই কলকাতায় ধরে রাখা গেল না। সমানধর্মা কোনো ব্যক্তির সঙ্গে বিদ্যালোচনা সম্ভবপর নয় দেখে তিনি তাঁর জন্মভূমিতে ফিরে গেলেন। সুখের বিষয় তিব্বতী বিদ্যায় অগ্রসর হয়ে গেছেন এমন ছাত্রদের লেখা-পড়ার সুবিধার জন্যে, আমরা অপর দুইজন বিদ্বান লামাকে এই বিভাগে নিযুক্ত করতে পেরেছি। তিব্বতী ছাপা ব্লক ও পুঁথিপত্রের যে মূল্যবান সংগ্রহ আমরা গড়ে তুলেছি, তাতে স্বর্গত শরৎচন্দ্র দাসের সংগৃহীত অনেক কিছু দানরূপে আমরা তাঁর ছেলের কাছ থেকে পেয়েছি। সম্প্রতি এই সংগ্রহে শতাধিক গ্রন্থ যোগ করা হয়েছে, সেইসব গ্রন্থের মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা হবে চল্লিশ হাজার। গ্রন্থের বিষয় হল ইতিহাস, তর্কশাস্ত্র, দর্শন, ব্যাকরণ ভেষজ, ফলিত জ্যোতিষ, ধর্মবিষয়ক মতামত প্রভৃতি নানা বিষয়ক বিদ্যা। প্রখ্যাত তিব্বতবিষয়ক পণ্ডিত মিঃ জন ভান মানেন-এর চেষ্টায় এই অদ্বিতীয় গ্রন্থ সংগ্রহ আমাদের হস্তগত হয়েছে। তিব্বতের সীমার বাইরে বর্তমানকালের পণ্ডিত ও গবেষকরা এই প্রথম এইসব দেখার ও পড়াশোনার সুযোগ লাভ করবেন। তিব্বতী বিদ্যার সঙ্গে নিকট সম্পর্কে যুক্ত, চীন ও জাপানী ভাষায় বৌদ্ধ ধর্মবিষয়ক শাস্ত্রাদি যাতে অনুধাবন করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে ওই দুই দেশের দু'জন শাস্ত্রবিদ্‌কে নিযুক্ত করা হয়েছে অধ্যাপকরূপে।

অতঃপর আমাদের ইতিহাস বিভাগের প্রতি একবার দৃষ্টিক্ষেপ করা যাক। সেই প্রসঙ্গের উল্লেখ করা মাত্র ভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্মরণ করছি

প্রফেসর যোগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মৃত্যুজনিত ক্ষতির কথা। বৃটিশ সাম্রাজ্যের য়ুনিভার্সিটি কংগ্রেস-এ আমাদের প্রতিনিধি রূপে যাঁরা যোগ দিতে গিয়েছিলেন প্রফেসর দাশগুপ্ত ছিলেন তাঁদের অন্যতম। জন্মভূমি থেকে বহু দূরে বিদেশে তাঁর অকাল মৃত্যু আমাদের পক্ষে গভীর শোকের কারণ। ত্রিশ বছরেরও বেশী কাল ধরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা প্রচেষ্টায় সকর্মক ভাবে যুক্ত ছিলেন—আমরা তাঁর সেই সেবার কথা সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি। আমাদের ইতিহাস বিভাগের দুটি শাখা—একটি হল সাধারণ ইতিহাস ও অপরটি ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও ভারত সংস্কৃতি। সাধারণ বিভাগে ইতিহাসের মূল উপাদানের ভিত্তিতে যে সকল বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেসব বিষয়ের মধ্যে আছে মহারাণী ভিক্‌টোরিয়ার রাজত্বকালে ইংলণ্ডের ইতিহাস, বুদ্ধের জন্ম থেকে শুরু করে মুসলমানদের আক্রমণ অবধি ভারতের ইতিহাস, প্রাচ্য দেশের প্রাচীন ইতিহাস, ইংলণ্ডের সংবিধানিক ইতিহাস, আন্তর্জাতিক আইনকানুনের নীতি ও ইতিহাস, ইসলাম ও ঐশ্লামিক সভ্যতার ইতিহাস। পলাশীর যুদ্ধ থেকে শুরু করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পর্যন্ত বাংলা দেশের রাষ্ট্রিক, প্রশাসনিক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ইতিহাস, মুসলমানদের আক্রমণ থেকে শুরু করে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন পর্যন্ত রাজপুত জাতির ইতিহাস, মহারাষ্ট্রীয়দের ইতিহাস, শিখদের ইতিহাস, ইংলণ্ড ও ভারতের অর্থ নৈতিক ইতিহাস, তুলনামূলক রাষ্ট্রনীতি, ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস, ভারতের জাতিভেদ ও জাতিবিজ্ঞান, বর্তমান চীন ও জাপানের ইতিহাস, ব্রিটিশ ভারতের সাংবিধানিক ইতিহাস, ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহের ইতিহাস। বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের ইতিহাস-চেতনা জাগাবার জন্য এই ধরনের বিরাট যোজনা, আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। এ ব্যবস্থা যদি করতে আমরা না পারতাম, তা হলে যেসব প্রশ্নের জবাবদিহি আমাদের করতে হত তার কয়েকটি

আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি। রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয় ও শিখ জাতির উদ্ভব, বিকাশ ও অবক্ষয়ের যথাযথ ইতিহাস কি বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা উচিত নয়? ইতিহাসের কোন ঘটনা পরম্পরায় চীন ও জাপানের দেশনায়কেরা তাঁদের প্রাচীন সভ্যতাকে পুনর্জীবিত করে আধুনিক রাষ্ট্ররূপে পুনর্গঠন করতে পেরেছেন—সে বিষয়ে কি এদেশের শিক্ষার্থীরা জানবেনা? জাতি ও বর্ণের সমস্যা নিয়ে সারা বিশ্বে যখন আলোড়ন চলছে, আমাদের শিক্ষার্থীরা কি ভারতের জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানবেনা? চারিদিকে দেখা যাচ্ছে বৈপ্লবিক আদর্শের সংঘাত, এই অবস্থায় কি আমাদের শিক্ষার্থীরা ফরাসী বিদ্রোহের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু জানার কোনো সুযোগ পাবেনা?

এবার ইতিহাস বিভাগের অপর শাখা অর্থাৎ ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও ভারত সংস্কৃতি বিষয়ে তুচার কথা বলা যেতে পারে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে পরম গৌরবের কথা এই যে সর্বপ্রথম এইখানেই কেবলমাত্র এই বিষয় অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য 'চেয়ার' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ই সর্বপ্রথম এই বিষয়ে উৎকর্ষ অর্জনের স্বীকৃতিতে শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ ডিগ্রি দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। দেশভক্ত ভারতীয়দের কাছে এ ঘটনা চিত্তাকর্ষী না হয়ে পারেনা। এই বিভাগে আবশ্যিক শিক্ষার বিষয় হল বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের ইতিহাস, উত্তর পৌরাণিক পর্বের রাষ্ট্রিক ইতিহাস এবং প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক ভূগোল। এ ছাড়া প্রত্যেক ছাত্রকে পাঁচটি বিষয় থেকে যে কোনো একটি ঐচ্ছিক বিষয় বেছে নিতে হয় বিশেষ শিক্ষার উদ্দেশ্যে। সেই পাঁচটি বিষয় হল: পুরাতত্ত্ব বা প্রত্নবিদ্যা, সামাজিক ও সাংবিধানিক ইতিহাস, ধর্মীয় ইতিহাস, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা, এবং জাতিভেদ ও জাতিবিজ্ঞানের ইতিহাস। এই বিভাগের অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীদের প্রচুর অসুবিধা ভোগ করতে হয় কারণ এইসব বিষয়ে প্রামাণ্য পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা স্বল্প যেহেতু অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসব বিষয়

এখনো পঠনীয় বিষয়ের মর্যাদা বা স্বীকৃতি লাভ করেনি। জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বহুবিধ দুষ্প্রাপ্য আকরগ্রন্থ থেকে অল্পে অল্পে সংগ্রহ করতে হয়েছে। এমন অনেক বিষয় আছে যার সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি যে কুমার শরৎকুমার রায়ের বদান্যতা এবং স্যর জন মার্শাল-এর সহৃদয় অর্থসাহায্যের ফলে, প্রফেসর ভাণ্ডারকর ও তাঁর সহকারীবৃন্দ অচিরে প্রখ্যাত বরেন্দ্রভূমিতে প্রত্ন আবিষ্কারের আশায় খননকার্যে হাত দিতে প্রস্তুত হয়েছেন। ব্রিটিশ ভারতের উচ্চশিক্ষার ইতিহাসে এই প্রথম শিক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে; ভারতীয় লিপিবিদ্যা, ভারতীয় চারুকলা, ভারতীয় মূর্তিবিদ্যা, ভারতীয় মুদ্রা পরিচয় বিদ্যা, ভারতীয় হস্তলিপিবিজ্ঞান, ভারতীয় স্থাপত্য, ভারতের অর্থ নৈতিক জীবন, ভারতের সামাজিক জীবন, ভারতের প্রশাসন, ভারতীয় ধর্মসমূহ, ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা, ভারতীয় গণিত ও ভারতের জাতিতত্ত্ব। অন্য যে কোন সভ্য দেশে এই ধরনের প্রাচীন প্রতিষ্ঠানাদি নিয়ে যদি চর্চা গবেষণা হত, তাহলে সে প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে সে দেশের সকল লোকের সহায়তা ও সহানুভূতি লাভ করত। দুঃখের বিষয় এদেশে স্বীকৃতি পাওয়া যায় বহু বিলম্বে। তৎসত্ত্বেও যখন প্রখ্যাত ও পক্ষপাতশূন্য মনীষীরা নিজের থেকে এগিয়ে এসে সাধারণ্যের সামনে, শিক্ষা ও জ্ঞানের অনাদৃত ক্ষেত্রে আমাদের এইসব প্রচেষ্টার বিষয়ে প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেন এবং বলেন যে এই প্রচেষ্টার ফলে সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে আমরা ভারতের প্রান্তসীমা বৃহত্তর ভারতের দিকে প্রসারিত করতে লেগেছি—তখন অবশ্যই আমাদের কাজে উৎসাহ লাভ করি। উপরোক্ত মনীষীদের মধ্যে আছেন প্রফেসর ফুশে, ডক্টর টমাস এবং প্রফেসর সিলভ্যাঁ লেভির মতো খ্যাতনামা পণ্ডিত ব্যক্তি। তবুও তো বৃহত্তর ভারতের সঙ্গে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির যোগাযোগের পুনরভ্যুদয় ঘটাতে এখনো আমরা সফলকাম হতে পারিনি।

খুবই দুর্ভাগ্য বলতে হবে, যে-সব বিষয়ে পঠন-পাঠন ও গবেষণা যে কোনো জাতীয় বিদ্যালয় অপরিহার্য বলে মনে করতে পারত, সেইসব বিষয়ে আমরা আগ্রহ দেখিয়েছি বলে আমাদের নিন্দা করা হয়। সেই প্রসঙ্গে একবার দৃষ্টি দেওয়া যাক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে। এটি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং এই নিয়ে প্রত্যেক দেশপ্রেমী নাগরিকের গৌরব বোধ করা উচিত ছিল। ১৯১৯ সালে ভারত সরকারের অনুমোদন নিয়ে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের বিভাগটি পত্তন করা হয়। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ইতিহাসে এই প্রথম সম্ভবপর হয় কোনো শিক্ষার্থীর পক্ষে তাঁর মাতৃভাষার ব্যুৎপত্তির ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ অভিজ্ঞান লাভ করা। নূতন নিয়মতন্ত্রে যে মৌল নীতিটুকু স্বীকৃত হয়েছে তা হল এই যে শিক্ষার্থীকে দুটি ভারতীয় ভাষা আয়ত্ত করতে হবে—মাতৃভাষায় তার জ্ঞান থাকতে হবে ব্যাপকভাবে এবং অতিরিক্ত কোনো ভারতীয় ভাষায় মোটামুটিভাবে। উপরন্তু যে সব মূল ভাষা থেকে যেমন পালি, প্রাকৃত ও পার্শিয়ান—ভারতীয় ভাষাগুলির উদ্ভব, সেগুলির সম্বন্ধে কাজ চালাবার মতো জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এ পর্যন্ত যে সকল মাতৃভাষাকে মুখ্য ভাষারূপে স্বীকার করে নেওয়া সম্ভবপর হয়েছে তার মধ্যে আছে বাংলা, হিন্দী, গুজরাতী ও ওড়িয়া। সম্পূরক ভাষারূপে স্বীকৃত ভাষার মধ্যে আছে বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, হিন্দী, উর্দু, মৈথিলি, গুজরাতী, মারাঠি, তেলুগু, তামিল, কন্নড়, মালয়ালাম এবং সিংহলী। ভিত্তি ভাষার মধ্যে আছে পালি, প্রাকৃত ও পার্শিয়ান। ভাষা বিষয়ক জ্ঞান ব্যতীত শিক্ষার্থীকে তার মাতৃভাষার ভিত্তিতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বেরও জ্ঞান লাভ করতে হবে। ভারতে দ্বিতীয় কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই যেখানে এমন বিস্তৃতভাবে ভারতীয় ভাষা চর্চার সুযোগসুবিধা করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগে পালিতে সুপণ্ডিত কতিপয় সিংহলী ভিক্ষু যদি না থাকতেন, সংস্কৃত বিভাগে যদি জৈন

ধর্মাবলম্বী একজন প্রাকৃতভাষাবিশারদ না থাকতেন, ঐশ্লামিক বিদ্যাবিভাগে যদি একাধিক পারসিক ভাষায় সুপণ্ডিত না থাকতেন, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগে যদি গুজরাতী ভাষায় সুপণ্ডিত একজন না থাকতেন, ইতিহাস বিভাগে যদি মারাঠি ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত একজন না থাকতেন, অর্থবিদ্যা বিভাগে একজন তেলুগুতে সুপণ্ডিত এবং নৃবিদ্যা বিভাগে একজন করে তামিল ও মালয়ালাম্ ভাষা ও সাহিত্যের লোক যদি না থাকতেন, তবে কি আমাদের পক্ষে এত রকম ব্যবস্থা করে ওঠা সম্ভব হত? জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে সুপণ্ডিত কিছু ব্যক্তি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন এবং এই প্রতিষ্ঠান সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার বেড়া ভেঙেছে—এই দুটি কারণের সমবায়ে এবং যেহেতু ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উপযুক্ত গুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা এখানে নিযুক্ত হয়েছেন—তার ফলে ভারতীয় ভাষাসমূহের জন্য এই নূতন বিভাগ পত্তন করা সম্ভব হয়েছে।

ভারতের বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যগুলির প্রাচীনতম নিদর্শন থেকে শুরু করে আজকের দিন পর্যন্ত, ভালো ভালো রচনা থেকে নির্বাচিত অংশ সংকলন করে, একটি গ্রন্থমালা প্রকাশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রায় বারো বছর আগে আমরা রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনকে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য থেকে এইরকম একটি নির্বাচন সংকলিত করতে বলেছিলাম। প্রাচীনতম বাংলা পুঁথি থেকে শুরু করে মধ্য-উনবিংশ শতাব্দীর মুদ্রিত পুস্তকাবলী থেকে যে অংশগুলি তিনি ধারাবাহিকরূপে নির্বাচন করেছেন, সেগুলি দুটি বিরাট গ্রন্থে সংকলিত হয়ে আট বছর আগে প্রকাশিত হয়েছে। অন্যান্য ভারতীয় ভাষাতেও অনুরূপ সংকলন প্রকাশ করার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করেছেন। এই মহৎ জাতীয় দায়িত্ব পালনে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষজ্ঞরা সহযোগ করার জন্য এগিয়ে এসেছেন। ওড়িয়া ও হিন্দী থেকে নির্বাচিত সাহিত্য-সংকলনের প্রথম খণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়ে গেছে। অন্যান্য ভাষা থেকে নির্বাচনের

কাজও অনেকখানি এগিয়ে গেছে। এই কাজে বিশ্ববিদ্যালয়কে সহায়তা করার জন্য বেশ কয়েকজন দেশ-হিতৈষী ও সংস্কৃতিবান ব্যক্তি এগিয়ে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল শোনপুর মহারাজার নাম—ওড়িশার এই সামন্ত রাজা ওড়িশার সাহিত্য-সঞ্চয়ন ছাপিয়ে প্রকাশ করার সমস্ত ব্যয় ভার বহন করেছেন। ইন্দোরের হোলকার মহারাষ্ট্র সাহিত্য-সঞ্চয়ন প্রকাশের সঙ্গে অনুরূপভাবে সংযুক্ত হতে চেয়েছেন। কলকাতার প্রখ্যাত নাগরিক শ্রী আর. ডি. মেহতা জেন্দাবেস্তা থেকে সংকলিত সঞ্চয়ন প্রকাশ করার জন্য একটি মোটা অঙ্কের টাকা দান করেছেন। আসাম-এর সুযোগ্য সন্তান শ্রী ভোলানাথ বড়ুয়া অসমীয়া সাহিত্য সংকলন প্রকাশের জন্য দশ হাজার টাকার একটি দান দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। কলকাতার বাইরের কতিপয় সংস্কৃতিবান ব্যক্তি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ধরনের কাজে মদত দেবার জন্য এগিয়ে এসেছেন—এ থেকে তাঁদের গুণগ্রাহিতারই পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রী সনৎ কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর যে বিরাট বাংলা পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ আমাদের দান করেছেন, তার ফলে ভারতীয় ভাষায় গবেষণার ক্ষেত্র প্রশস্ততর হবে। দিনাজপুরের টংকানাথ চৌধুরী মৈথিলী সাহিত্যে একজন অধ্যাপক নিয়োগের খরচখরচা দিয়েছেন। রাজা কীর্ত্যানন্দ সিংহ ও তাঁর বানেলী শ্রীনগরের অন্যান্য ওয়ারিশ মৈথিলীতে গবেষণার জন্য একজন অধ্যাপকের খরচ দিয়ে চলেছেন। ময়মনসিং-এর গোপালদাস চৌধুরী বাংলায় একজন অধ্যাপকের খরচ বহন করেন, তেমনি ওড়িয়া অধ্যাপকের খরচটুকু বহন করেন শোনপুরের মহারাজা।

কিন্তু এই ধরনের কাজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো দরাজ হাতের সাহায্য প্রয়োজন। এখানে আমরা যে বিরাট কাজের সূত্রপাত করেছি তার নিহিত তাৎপর্যটুকু কি দেশের লোক বুঝতে পারছেন না? ভারত যদি জগৎ সভায় নিজের আসন ফিরে পেতে চায় তাহলে ভারতীয় ভাষা-গুলির চর্চা কত যে গুরুত্বপূর্ণ সে কি তাঁরা বুঝতে পারছেন না? তাঁরা

কি জানেন না মনন চিন্তনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারত এককালে যেসকল শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল, কিছু সংকীর্ণমনা ও বিশিষ্ট পণ্ডিতেরা সেইসব সম্মানের আসন থেকে ভারতকে বিচ্যুত করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন? তাঁরা কি জানেন না কিছুকাল ধরেই একটা আন্দোলন চলছে এই কথা প্রমাণ করার যে বিজ্ঞান, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় ভারত মৌলিক কিছু দেয়নি—এবং এই ভ্রান্ত ধারণা উপযুক্ত প্রমাণের দ্বারা খণ্ডন করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর অধ্যাপক সমাজকে তো অনুরোধ করেইছেন, উপরন্তু তাঁদের মধ্যে থেকে একজনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচে দেশের প্রত্যন্ত প্রদেশে ঘুরে ঘুরে এইসব বিষয়ের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ও অন্যান্য সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন। এ দেশের লোক কি জানেন না যে একদল লোক প্রচণ্ড চেষ্টা করে চলেছেন এই কথা প্রমাণের জন্য যে এদেশের চারুকলা গ্রীক্ চারুকলারই অনুকরণ মাত্র, এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় কয়েকজন অধ্যাপক নিযুক্ত করেছেন এই অদ্ভুত অনুমান যে ভিত্তিহীন সেকথা প্রমাণের জন্য? প্রফেসর ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ্-এর মতো একজন সাবধানী ঐতিহাসিকও জোর গলায় প্রচার করেছেন যে প্রাচীন ভারতে লোকতন্ত্রের কোনো চিহ্ন ছিলনা বলে ভারত আত্মনিয়ন্ত্রণের অযোগ্য। সত্যের এই আশ্চর্য বিকৃতির উৎসাদন করেছেন এ-দেশের কতিপয় ইতিহাস শাস্ত্রী—তাঁদের মধ্যে আছেন দেবদত্ত ভাণ্ডারকর, কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার ও নরেন্দ্রনাথ লাহা। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে মৌলিক গবেষণার সুযোগ দিয়ে, এঁদের সকলকেই প্রোৎসাহিত করেছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়। আমাদের মাতৃভূমির বহিঃস্থিত কোনো বিদ্যাকেন্দ্র আমাদেরই ভারত সভ্যতা নিয়ে বিচার করবে ও সে বিষয়ে চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত দেবেন—এমন পরিস্থিতি মেনে নেওয়া যদি আমাদের স্বাজাত্যবোধের বিরোধী বলে আমরা মনে করে থাকি, আশাকরি আমাদের দোষ ধরবেন না। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত

প্রাচ্য ভূখণ্ডের আদর্শ ও মূল্যবোধকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করে, সেই জায়গায় পশ্চিমী সভ্যতা পুরোপুরি চাপিয়ে দিয়ে, কোনো কোনো প্রাচ্য দেশ আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা বিফল হয়েছে। একথাও সত্য যে আমাদের জাতীয় জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানও বহিরাগত বলে এখনো উদ্ভট বলে বিবেচিত হয়। অতীতে ভারত যেমন সুসভ্য দেশ ছিল—আজও তেমনিই আছে। মানুষের অগ্রগতির দিক থেকে পশ্চিমের সভ্যতা যতই কার্যকর হোক না কেন, যে-সব মূল্য বা আদর্শ আমাদের সভ্যতার প্রাণ-স্বরূপ, সেগুলিকে হটিয়ে দেবার কিংবা ধ্বংস করবার অধিকার কারো থাকতে পারে না। আমি জোর গলায় বলতে পারি ভারতের অপর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত-সভ্যতার প্রতি এইভাবে শ্রদ্ধাশীল হয়ে কাজ এখনো শুরু করা হয়নি যেমন করা হয়েছে আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে।

আমার হাতে যতটুকু সময় আছে তার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় অন্যান্য বিভাগে কতটুকু কী কাজ করতে চেয়েছেন বা পেরেছেন—সে বিষয়ে দুচার কথাও বলতে পারা সম্ভবপর নয়। কলা বিভাগের ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে, দর্শনে, অর্থবিদ্যায় ও বাণিজ্য বিদ্যায় উৎসাহী ও সন্ধিৎসু ছাত্রদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। ইংরাজী বিভাগের সুযোগ্য অধ্যাপকগণ ইংরাজী নিয়ে সামূহিক চর্চা করে থাকেন—ভাষা ও সাহিত্য উভয় দিক থেকেই। কিন্তু তদপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হোল এই যে আমরা পৃথিবীর সঙ্গে চিন্তার লেনদেনের মাধ্যমরূপে ইংরাজীকে স্বীকার করে নিয়েছি। বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির তুলনামূলক চর্চায় ইংরাজী এখন আমাদের প্রধান সহায়। দর্শন বিভাগের সুযোগ্য অধ্যাপকবৃন্দ প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক দর্শনের সঙ্গে সম্যক পরিচয় সাধন করিয়ে দিচ্ছেন বিশদ ব্যাখ্যা সহযোগে। আরো উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই প্রথম আমরা মূল শাস্ত্রাদির উৎস অবলম্বনে ভারতীয় দর্শনের প্রত্যেকটি শাখায় পূর্ণাঙ্গ চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করতে পেরেছি। যদি কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নিজেকে

জাতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে পরিচয় দিতে চায়, তাহলে সুদূর অতীতে ভারতের ঋষিকল্প মনীষীরা দর্শনের চিরন্তন সমস্যাগুলির কীভাবে মীমাংসা করতে চেয়েছিলেন, সে বিষয়ে যদি শিক্ষার্থীদের বিশদভাবে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা না করতে পারেন, তাহলে সে দাবী মিথ্যা প্রমাণ হতে বাধ্য। ভারতের আর্য পণ্ডিতেরা দর্শনের মূল সমস্যা নিয়ে কত গভীরভাবে বিচার করে গেছেন। পরবর্তী যুগে নানা দেশে নানা দিকে দার্শনিক চিন্তার বিচিত্র বিকাশ হওয়া সত্ত্বেও, ভারতীয় দর্শন সভ্য জগতের প্রত্যেক বিদ্যাকেন্দ্রে এখনো শ্রদ্ধা ও সমাদরের বিষয়। রাষ্ট্রীয় অর্থবিদ্যা ও রাষ্ট্রীয় দর্শন বিভাগে কতিপয় বিশিষ্ট অধ্যাপক অর্থবিদ্যা ও বাণিজ্যবিদ্যার ক্রমবর্ধমান ক্ষেত্র নিয়ে শিক্ষাদান করেছেন। ভারতীয় নাগরিক ও সমাজ-সেবীদের আগ্রহ উদ্দীপ্ত করার জন্য আমরা নিম্নলিখিত বিষয়ে বিশেষ বক্তৃতামালার আয়োজন করেছি—দুর্ভিক্ষ ও অন্নাভাব, সমবায়, রেলওয়ে শ্রমশিল্প সংগঠন, মুদ্রা-সংক্রান্ত সমস্যা, জমির বিলিব্যবস্থা, গ্রামসমাজ, শ্রমিক সমস্যা, পরিসংখ্যান বিদ্যা, এবং রাষ্ট্র সংগঠনের রূপ। উপরন্তু, বর্তমান পর্বে আমরা বাণিজ্যিক—যথা হিসাবরক্ষণ, ব্যাঙ্কিং ও বাণিজ্য-বিষয়ক আইন কানুন—বিষয়েও বক্তৃতামালার আয়োজন করেছি। জাতীয় জীবনে এখন ক্রান্তিকাল, মানুষের প্রয়োজন সাধনের জন্য মানুষ এখন পৃথিবীকে ঢেলে সাজাতে লেগেছে। এই সময়ে অর্থবিদ্যা ও বাণিজ্য বিদ্যার গুরুত্ব যে কতখানি সে তো সহজেই অনুমেয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় এ দেশের শিক্ষিত সমাজের মুষ্টিমেয় লোকও কি এই বিশেষ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মপ্রচেষ্টায় সামান্য পরিচয়লাভের জন্যও উদ্‌যোগী হয়েছেন? খুবই শোচনীয় বলতে হবে যে সরকারী কিংবা বেসরকারী কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে এখনো একজন ব্যক্তিও স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হয়ে এই দুই বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে আনুকূল্য করতে এগিয়ে আসেন নি।

সচরাচর যেসব বিষয়কে বৈজ্ঞানিক বিষয় বলা হয় তাদের বিষয়ে

বলবার আগে বিশ্ববিদ্যালয় কলা বিভাগ ও বিজ্ঞান বিভাগের মধ্যবর্তী দুটি বিষয়ে অর্থাৎ গবেষণাভিত্তিক মনোবিদ্যা ও নৃবিদ্যায়—কি কি কাজ করেছেন সে কথা একটু বলা যাক। জ্ঞানের এই দুটি ক্ষেত্র এখনো কিছুটা অস্পষ্ট হলেও ক্রমেই যেন প্রসার লাভ করছে—বিশেষ করে ফ্রান্স, জার্মেনী, ইতালী ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রাগ্রসর বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে। সমাজতত্ত্বের দিক থেকে এই দুটি জ্ঞানের অনুশীলনে ব্যবহারিক ফলাফল কত যে মূল্যবান হতে পারে, সে বিষয়ে অনেক কিছু বলা যায়। সেকথা না বলে, আমি কেবল এই দুই বিভাগের শিক্ষকেরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে যে সব ভালো ভালো কাজ করেছেন, তার একটু উল্লেখ করতে চাই। কয়েকজন ডাক্তার এঁদের সঙ্গে স্বেচ্ছাক্রমে সহযোগিতা করছেন—এই সুযোগ নিয়ে এঁরা আমাদের কলেজগুলির ছাত্রদের শরীর স্বাস্থ্য সুবিহিতভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন। তিন হাজার ছাত্রের পরীক্ষা হয়ে গেছে তবু এখনো কাজ অব্যাহত চলছে। আমাদের ছাত্র হিতসাধন সমিতি এইসব পরীক্ষার ভিত্তিতে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন, তা থেকে কিছু কিছু অংশ ভাসাভাসা ভাবে পড়লেও দেখা যাবে ছাত্র সমাজের শরীর-স্বাস্থ্যের অবস্থা কি রকম আশংকাজনকভাবে খারাপ। সভ্য জগতের অন্য কোনো দেশের বিশ্ববিদ্যালয় যদি এই রকম কাজ হাতে নিত এবং কাজের ফলাফল সাধারণ্যে প্রকাশ করত, তা হলে জনসমাজের দৃষ্টি পড়ত এদিকে এবং এ কাজের জন্য সরকার ও লোকসাধারণ নিশ্চয় অর্থসাহায্য করত মুক্ত হস্তে।

বিজ্ঞানের শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কতটুকু কী করতে পেরেছেন এবার সেই কথাটুকু পাঁচজনের বোধগম্য করে উপস্থিত করতে চাই। গণিত শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা দুটি বিভাগের কাজ অব্যাহত রাখতে পেরেছি—তার একটি হল তাত্ত্বিক গণিত ও অন্যটি ফলিত গণিত। গণিতের উচ্চতর ক্ষেত্রে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন ও জীববিজ্ঞানের সঙ্গে ওতপ্রোত সম্বন্ধ ঘটে—এইরকম একটা কথা অস্পষ্ট রহস্যের মতো শোনা

যায়। ভারতে একমাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর গণিতের সেই রহস্যটুকু উদ্‌ঘাটনের উপযুক্ত রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের য়ুনিভার্সিটি কলেজ অব সায়েন্স এণ্ড টেকনোলোজি-র অধিকার বর্তমানে যতগুলি বিজ্ঞানকে 'নির্ভুল' বিজ্ঞান বলা হয় সেগুলির তাত্ত্বিক ও ফলিত উভয় দিকেই বিস্তৃত। কিন্তু আপনাদের সকলের কাছে খোলাখুলি ভাবে স্বীকার করতে আমার বাধা নেই, আমার ছাত্রবয়সে আমি বিদ্যা জননীর যে রূপ কল্পনা করেছিলাম জ্ঞানবিজ্ঞানের বরদাত্রীরূপে সেই রূপ এখনো আমার চক্ষুর অগোচরে রয়ে গেছে। আমার সেই স্বপ্ন অংশত সত্য হয়ে থাকলেও সম্পূর্ণ সত্য হয়ে উঠেনি। বিজ্ঞানের সামান্য ছাত্র হিসাবে আমি তখনই বুঝতে পেরেছিলাম সভ্য জগৎ বিজ্ঞানের কাছে কেন এত ঋণী। বিজ্ঞান বস্তু জগতে মানুষের জন্য নানা সুখসুবিধার বিধান করছে বলে মানুষ তার কাছে বাধিত নিশ্চয়। মানুষের প্রকৃত ও মুখ্য ঋণ এই কারণে যে বিজ্ঞান মানুষের চিত্তকে মুক্তি দেয়—অন্ধকার থেকে তাকে আলোকের দিকে নিয়ে যায়। তার কারণ আর কিছু নয়—বিজ্ঞানের পা থাকে মাটিতে, কিন্তু মাথা থাকে উর্ধ্ব আকাশে। প্রকৃতিকে জানা ও তাকে স্ববশে এনে ধূলিমুঠি থেকে সোনা আহরণ করে মানুষের সম্পদ ও আরাম বৃদ্ধি করাই বিজ্ঞানের প্রাথমিক লক্ষ্য যদিচ, তার সত্যকার লক্ষ্য এমন সত্যের সন্ধান যা মানুষের মনকে কুসংস্কার ও দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়। বিজ্ঞানের দ্বারা চিত্তের মুক্তি সাধিত হয় ও মানুষের চিন্তার জগৎ বহুবিস্তৃত হয় বলেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট সন্তানদের একজন, ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রচেষ্টারূপে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অব সায়েন্স নামক বিজ্ঞান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। আমিও স্থির বুঝেছিলাম যে বিজ্ঞান মনের শৃঙ্খল মোচন করে, অন্ধ সংস্কারকে হটিয়ে দিয়ে আসন রচনা করে যুক্তিবিচারের, মনোরাজ্যে স্বাধীনতার বাণী আনে বিজ্ঞান। তাই আমিও চেয়েছিলাম বিজ্ঞান কলেজের

মতো একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে এবং আমার এই মনোবাঞ্ছা প্রকট করে, ভারতের দুজন বিশিষ্ট সন্তানের দ্বারস্থ হয়েছিলাম অর্থসাহায্যের আশায়। তাঁরা হলেন স্যর তারকনাথ পালিত ও স্যর রাসবিহারী ঘোষ। ব্রিটিশ-ভারতের উচ্চশিক্ষার ইতিহাসে এই দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তির বদান্যতার তুলনা হয় না। উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ নয়, শেয়ার ফাটকার নাফা নয়, ব্যবহারজীবীরূপে তাঁদের আজীবন পরিশ্রমের যাকিছু উদ্বৃত্ত সম্পদ—তাঁরা নিঃশেষে দান করেছিলেন। তাঁদের এই বিরাট দান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে আয় হল তাই দিয়ে একটি নয় দুটি নয়—আটটি প্রফেসর পদ সৃষ্টি করা সম্ভবপর হল—রসায়নের পালিত চেয়ার, পদার্থ বিজ্ঞানের পালিত চেয়ার, ফলিত গণিতের ঘোষ চেয়ার, উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ঘোষ চেয়ার, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞানের ঘোষ চেয়ার এবং ফলিত রসায়নের ঘোষ চেয়ার। প্রত্যেক চেয়ারের সঙ্গে গবেষক ছাত্রদের স্কলার রূপে সংযুক্ত করে দেওয়া হল। এর পরে বিদ্যাজননীর প্রতিনিধি হয়ে আমি খায়রার কুমার গুরুপ্রসাদ সিং-এর শরণ নিই। তিনি আমার হাতে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা তুলে দেন তাঁর ঔদার্যের দানরূপে। তাঁর ইচ্ছাক্রমে সেই অর্থ কলা ও বিজ্ঞান উভয় বিভাগে উচ্চশিক্ষার উন্নতির জন্য বরাদ্দ করা হয়। তাঁর দানের টাকায় আমরা রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, ভারতীয় শিল্পকলা, ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞান ও ধ্বনি বিজ্ঞান—এই পাঁচটি বিষয়ে 'চেয়ার' সৃষ্টি করতে পেরেছি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে স্যর রাসবিহারী ঘোষের দান থেকে কেবল যে আমরা একাধিক 'চেয়ার' সৃষ্টি করতে পেরেছি এমন নয়, তাঁর অর্থব্যবস্থা ও ইচ্ছা অনুসারে তাঁর নামে আমরা কতকগুলি 'ট্রাভেলিং ফেলোশিপ'ও পত্তন করেছি। বিদেশের শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে অনুসন্ধানের কাজ চালাবার জন্য অথবা বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বিদেশে গবেষণার জন্য এই বৃত্তি নির্ধারিত। আমাদের বাৎসরিক আয় থেকে আমরা উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যার দুটি

'চেয়ার'-এর খরচ নির্বাহ করছি। যদিচ আমাদের আয়ের উপায় নিতান্তই সীমাবদ্ধ এবং আমাদের সঞ্চয়ের তহবিলও যৎসামান্য—তবু য়ুনিভার্সিটি কলেজ অব সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজি প্রতিষ্ঠায় ও সাজসরঞ্জামে এ পর্যন্ত যে ষোলো কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, তার দশ লক্ষ টাকাই আমাদের নিজেদের তহবিল থেকে দিতে হয়েছে। প্রশ্ন জাগতে পারে দেশের ধন-ভাণ্ডার যাঁদের হাতে, তাঁরা তাহলে কী করলেন ? তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ এই কারণে যে অন্য খাতে ব্যয় করার জন্য টাকা থেকে মাসে হাজার টাকা বিজ্ঞান কলেজ বাবদ তাঁরা খরচ করবার অনুমতি দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায্য দাবী নিয়ে তাঁদের কাছে বারম্বার উপস্থিত হলেও, এই একটি ব্যাপার ছাড়া আর সব বিষয়েই তাঁরা ক্রমাগত 'না' বলে গেছেন। স্যর তারকনাথ পালিত ও স্যর রাসবিহারী ঘোষের স্বার্থ-বিসর্জনের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তাঁদের চোখের সামনে থাকলেও, যেসব প্রশাসক দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং জনগণের সেবাই যাঁদের কর্তব্য-বিশেষ, তাঁরা যে কী করে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারেন—এটা আমার কাছে দুর্জ্ঞেয় বিস্ময়ের ব্যাপার। তত্রাচ ভুলে গেলে চলবেনা যে সম্ভবত কলা বিভাগের তুলনায় এই নব-গঠিত বিজ্ঞান বিভাগই অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব বিশ্বের কাছে বেশি করে তুলে ধরেছেন। এখানকার ছাত্র ও অধ্যাপকেরা মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে স্বীকৃতি ও সম্মান লাভ করেছেন। আজ এই বিজ্ঞান কলেজ উচ্চ মেধা ও কৃতিত্ব সম্পন্ন তরুণ বিজ্ঞানীদের ধাত্রীস্বরূপ—গণিতে, পদার্থবিদ্যায়, রসায়নে, উদ্ভিদবিদ্যায়, প্রাণীবিদ্যায় তাঁদের গবেষণার ফলাফল য়ুরোপ, আমেরিকা ও জাপানের শীর্ষস্থানীয় বিদ্যাপীঠগুলিতে আদৃত হয়েছে ও সেসব জায়গায় বিজ্ঞান সমিতি ও বিজ্ঞান পত্রিকা কর্তৃক সাগ্রহে প্রকাশিত হয়েছে।

কাজ অনেক হয়েছে—সে আমি জোর গলাতেই বলতে পারি, সেই

সঙ্গে এ কথাও বলা দরকার যে অনেক কাজ এখনো বাকি আছে। শ্রমশিল্প বিস্থার ক্ষেত্রে আমাদের প্রয়াস আরো অনেক বিস্তার লাভ করা দরকার। অতীতের সভ্য জগতে বিদ্যার ক্ষেত্র ছিল সীমাবদ্ধ, আজকের দিনে সেই ক্ষেত্র বিস্তৃততর করার একটা মহৎ সুযোগ এসে উপস্থিত হয়েছে। শ্রমশিল্প ও শিক্ষাকে হাতধরাধরি করে আজ এগিয়ে যেতে হবে, কারণ আজ যে যুগে আমরা বাস করছি সেখানে শ্রমশিল্পের উন্নতি যেমন দরকার, তেমন শিক্ষারও। নানা বিষয় নিয়ে শ্রমশিল্পের কারবার, সেইসব বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন সমধিক। অর্থনীতি ও শিল্পায়নের উন্নতি থেকে মানুষের সমূহ মঙ্গল যদি আমাদের কাম্য হয়, তাহলে সেই কল্যাণকর প্রভাব ক্রমবর্ধমান হারে সৃষ্টি করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মশালাতেই। আমি মনে মনে দেশের সর্বত্র প্রযুক্তিবিদ্যার বিস্তারের কথা কল্পনা করি। সেই প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্র কেবল যে বিশ্ববিদ্যালয় হবে এমন নয়—দেশের সমস্ত স্কুলে প্রযুক্তিবিদ্যা শেখানোর ব্যবস্থা থাকা দরকার। আমি জানি অনেক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী আছেন যাঁরা কোনো বৃত্তি বা পেশার জন্য শিক্ষালাভে আগ্রহী কিন্তু তাঁদের সেই আগ্রহ মেটাবার কোনো পথ নেই। এইরকম সামগ্রিক পরিকল্পনাকে রূপ দিতে হলে প্রভূত পরিমাণে যোগ্য শিক্ষকের প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় এইরকম কাজের দায়িত্ব নিতে ইচ্ছুক বললেই সবকথা বলা হয়না, কারণ সে ইচ্ছা পূরণ করতে হলে অকৃপণ হাতে অর্থব্যবস্থা করতে হয় ল্যাবরেটরি, ম্যুজিয়ম ওয়র্কশপ এবং আনুষঙ্গিক সাজসরঞ্জাম যন্ত্রপাতি ইত্যাদির জন্য। বে-সরকারী বদান্যতার উৎস এখনো যে শুকিয়ে যায়নি তার প্রমাণস্বরূপ বলি যে অতি সম্প্রতি শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় রাণীগঞ্জের সন্নিহিত তাঁর মূল্যবান সম্পত্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করতে চেয়েছেন—যদি আমরা সেখানে খনিজ বিজ্ঞানের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারি। এই ধরনের কাজ তো চালু করা যায়, কিন্তু সম্প্রসারণ করতে হলে তো যথেষ্ট পরিমাণে সরকারী

অর্থসাহায্য ছাড়া কিছু হতে পারে না। প্রযুক্তিবিদ্যা এবং কৃষিবিদ্যা—এই দুই বিদ্যার প্রসার করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আগ্রহের অভাব নেই, কিন্তু সমস্তই শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে সরকারী অর্থ সাহায্যের উপর।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ সম্প্রসারণের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তা যে ঝোঁকের মাথায় কিংবা আকস্মিকভাবে গ্রহণ করা হয়নি, সে বিষয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। যেসব কাজ ইতিপূর্বে হাতে নেওয়া হয়েছে এবং যাকিছু ভবিষ্যতে নেবার কথা—সে সমস্তই সুচিন্তিতপূর্ব। জাতির জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সত্যকার ভূমিকা কী হওয়া উচিত সেই বিষয়ে আমাদের স্পষ্ট ধারণার দৃঢ় ভিত্তির উপর এই সকল পরিকল্পনা রচিত। যে অতীতের মৃত্যু নেই সেই অতীতের ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান আহরণ করে বর্তমানকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃত্যবিশেষ। সারা বিশ্বের জ্ঞান যাঁরা নিজেদের পাণ্ডিত্যগুণে আপন করে নিতে পেরেছেন, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে ও চারুকলায় যাঁরা সত্যসুন্দরের পূজারী, বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের আশ্রয়। কিন্তু প্রাচীন অতীতকে নিয়ে মগ্ন থাকলে তো চলবেনা। যে বর্তমান ভবিষ্যতের দিকে ক্রমাগত আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলেছে তার সঙ্গে সংগতি রেখে আমাদের জ্ঞানের পরিধি নব নব উদ্ভাবিনী প্রতিভার প্রশস্ততর ক্ষেত্রে প্রসারিত করতে হবে। মনে রাখতে হবে এইসব জ্ঞানের লক্ষ্য ও সত্য ও সুন্দরের জন্য মানুষের চিরন্তন আকুতি। বিজ্ঞান ও সমাজ, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও লোকতন্ত্র, বুদ্ধিবৃত্তি ও আচরণের যেসব সমস্যা আজকের দিনের সমস্যা—সেই সেই বিষয়ে ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের চিন্তাভাবনা দেশের জনসম্প্রদায়ের বোধগম্য করে পরিবেশন করাও বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃত্যবিশেষ। এই লক্ষ্য সাধনের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় জনসাধারণের মঙ্গল বিধান করতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত নরনারী যদি জনমতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব করতে পারেন, যদি আইন, চিকিৎসাশাস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারীং, শিক্ষণ, বাণিজ্য থেকে শুরু করে স্থাপত্য,

কৃষি, ব্যাঙ্কিং, সাংবাদিকতা ও প্রশাসন পর্যন্ত তাবৎ মাথা খাটাবার কর্মী বিশ্ববিত্যালয় থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন—তাহলে দেশে স্বাধীন চিন্তার প্রসার হবে, স্বাস্থ্য ও সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। যে বিশ্ববিত্যালয় সমগ্র জাতির উন্নতিকল্পে জীবনের সর্ব বিভাগে কাজ করতে চায়, সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে তাকে যদি সংকীর্ণ ক্ষেত্রে কাজ করতে হয়, তাহলে সে হয় একপ্রকার অনাহার বা অর্ধাহারে থাকার মতো। এ বিশ্ববিত্যালয় শুদ্ধ জ্ঞানের অচলায়তন নয় আবার নিছক প্রযুক্তিবিত্যার মহাকেন্দ্রও নয়। আমাদের এই বিশ্ববিত্যালয়ে প্রত্যেক অধিতব্য বিষয়ের আপন আপন দাবী আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিতে চাই। ইতিহাস বলবে যে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সংস্কার করতে হলে তৎসংক্রান্ত পরিকল্পনা ইতিহাসের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে হবে। দর্শন বলবে যে জ্ঞানের তাবৎ তত্ত্ব ও প্রণালী নিয়ে তার কারবার। সাহিত্য বলবে মানুষের জীবনে মাধুর্য ও দীপ্তি সঞ্চার করে এমন সব ভাব ও বাণী তার উপজীব্য। কলাশিল্প বলবে সৃষ্টিকল্পনার সে প্রস্ফুটিত পুষ্প, জীবনকে সে পূর্ণতর ও সমৃদ্ধতর করে। ফলিত বিজ্ঞান বলবে যে বস্তুজগতে জাতি যদি ঐশ্বর্যবান হতে চায়—তাহলে সে তার সহায় হবে। অর্থবিত্যা বলবে ঐশ্বর্য কেবল সঞ্চয় করলে তো চলবেনা, তাকে সুবিহিত ভাবে বণ্টন করতে হবে। সেই সমস্যা মেটাতে পারে অর্থবিত্যা। সর্বশেষে সাধারণভাবে বিজ্ঞানের শিক্ষা দাবী পেশ করে বলবে দর্শন, মনস্তত্ত্ব ও শারীর বিদ্যার মূলে আছে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানই মানুষের কল্পনাশক্তিকে উদ্দীপিত করে, বুদ্ধির বিকাশ ঘটায়। এইসব দাবীর মধ্যে কোনোটিকেই আমরা তুচ্ছ করতে পারিনা, অগ্রাহ্য করতে পারিনা।

আমার দৃষ্টিতে বিশ্ববিদ্যালয় বিরাট এক জ্ঞান ভাণ্ডার, মাননির্ণয়ের বিরাট এক প্রতিষ্ঠান, বিদ্যার মহাকর্মশালা, চিন্তাবীর ও কর্মবীর—এই উভয় শ্রেণীর মানুষ তৈরী করার বিশাল পরীক্ষাগার। বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রের হাতে এমন একটি অস্ত্র যার সাহায্যে রাষ্ট্র জ্ঞান আহরণ, সংরক্ষণ,

বর্ধন, বণ্টন ও প্রয়োগের তাবৎ ব্যবস্থা করতে পারেন উপরন্তু নূতন জ্ঞানের স্রষ্টাদের পোষণ করতে পারেন।

বাংলার জনগণ, আজ আপনাদের বসতবাটীর দেহলিতে দাঁড়িয়ে আছে এক মহাবিদ্যালয়—এ বিদ্যালয় সাহিত্য, বিজ্ঞান ও চারুকলার ক্ষেত্রে আপনাদের দেশের উন্নতির জন্য নিবেদিত। এর কলাবিভাগে উদ্ঘাটিত মানুষের চিন্তার জগৎ, এর বিজ্ঞান বিভাগ বিশ্বসৃষ্টির নিয়মশৃঙ্খলা বিষয়ে অবহিত হয়ে প্রকৃতির শক্তিকে মানুষের কাজে নিয়োগ করতে চায়। উপরন্তু ভারতের অতীত গৌরব ও ভারত সভ্যতার নানা দিক নিয়ে বিশদ আলোচনার সূত্রে ক্রমেই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে এদেশে বহুবৈচিত্র্যের মধ্যে একটি ঐক্যসূত্র অব্যাহতভাবে আমাদের সকলকে এক জাতিরূপে মিলিয়েছে।

স্বাজাত্যবোধের দিক থেকে এটি এক মহৎ ঘটনা। আপনাদের আবাস-গৃহের অনতিদূরে রয়েছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্বৎসমাজ। প্রজন্মে প্রজন্মে আপনাদের সন্তানেরা এখানকার শিক্ষক অধ্যাপকদের কাছে তাদের তরুণ মনের জিজ্ঞাসা নিয়ে উপস্থিত হবে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে ও অন্য নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে প্রগতির পথে পা বাড়াবে। বাংলার জনগণকে উদ্দেশ্য করে আজ আমি বলতে চাই যে আজ তাঁদেরই স্থির সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ—এই বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় সম্পদরূপে গড়ে তুলতে পারেন এই দেশেরই লোকেরা। দেশ ও জাতির প্রতি কর্তব্যপরায়ণ ও দায়িত্বশীল প্রত্যেক নাগরিককে আজ আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে বলি, তাঁরা যেন অজ্ঞ ও পক্ষপাতদুষ্ট সমালোচকদের নিন্দাবাদে কান না দিয়ে, আমাদের পাশে সমুচিত ও সমান আকুতি হয়ে দাঁড়ান, তাহলে আমরা একযোগে সমান লক্ষ্যে একদিন নিশ্চয়ই গিয়ে পৌঁছতে পারব। মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রশস্ত ক্ষেত্রে বিচরণ করা কালে, বিশ্ববিদ্যালয়ই দেখিয়ে দিতে পারে জীবনের নানা সমস্যা কীভাবে

বিচার করলে জাতির নিরাপত্তা ও উন্নতি বিধান সম্ভবপর। স্বাজাত্যবোধ জাগ্রত করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়কে যে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়, সেই কথা ভেবে আমরা সর্বদা চেয়েছি বিশ্ববিদ্যালয় যেন জাতির জীবনের সঙ্গে কল্যাণসূত্রে অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত থাকে। জাতির জীবনচর্যায় বিশ্ববিদ্যালয় নিষ্ক্রিয় দর্শকমাত্র নয়, সক্রিয় ও সজীবভাবে জাতির অগ্রগতির সঙ্গে তাকে সমান কদমে সামিল হতে হবে। সমাজ থেকে স্বতন্ত্র করে, যদি উচ্চ কোনো সম্মানের মিনারে বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থাপনা করা হয় তাহলে জাতীয় স্বার্থের দিক থেকে এই প্রতিষ্ঠানের মৃত্যু অনিবার্য। পক্ষান্তরে যদি জাতির জীবনের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়কে ওতপ্রোত সংযুক্ত করা যায়, তাহলে জাতি হিসাবে বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের কালে এই প্রতিষ্ঠান কেবল যে সমাজকে শিক্ষিত করে তুলতে পারেন এমন নয়, পরন্ত স্বদেশ চিন্তায় নেতৃত্বও গ্রহণ করতে পারেন।

জাতি ও সমাজের সেবায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকার বিষয়ে অনেক কথা বলা সত্ত্বেও, একটি বিরাট সম্ভাবনার বিষয় সর্বদা আমি নিজের ও সকলের সামনে তুলে ধরতে চাই—সে বিষয়টি হল রাষ্ট্র ব্যাপারে গণতন্ত্রের সমাগম। ইতিহাস ও রাষ্ট্র দর্শনের একজন প্রাজ্ঞ ছাত্র একবার বলেছিলেন যেখানে গণতন্ত্রের দুর্বলতার চিহ্ন দেখা দেবে—সেইখানেই শিক্ষার সাহায্যে প্রতিকারের সুযোগ নিতে হবে দেশের শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে। আমার ধারণা এই উক্তিটুকু বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য—কারণ গণতন্ত্রের শক্তির দিক যেমন আছে তেমনি দুর্বল দিকও আছে। যেখানে জনসাধারণ অজ্ঞ ও কুসংস্কারাবদ্ধ, যেখানে নানাস্তরের শিক্ষার প্রশস্ত ব্যবস্থা সম্বন্ধে জনমত উদাসীন, গণতন্ত্র সেখানে বিপন্ন হতে বাধ্য। শিক্ষাব্রতী যিনি তাঁর কাজ হল সমাজ দেহের দুর্বলতাটুকু কোথায় ও কেমন ঠিকঠাক বুঝে নেওয়া। তা যদি তাঁকে করতে হয় তাহলে তাঁকে মিনার থেকে নেমে আসতে হবে সমতটে এবং অবস্থা বুঝে তাঁকে নূতন গণতন্ত্রী সমাজে শিক্ষার বিস্তারের

ব্যবস্থা করতে হবে। আখেরে দেশকে মুক্তির পথে নিয়ে যাবার তাই হবে উপায়। এইভাবে জাতীয় জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগ যদি আমরা স্থাপন না করতে পারি, তাহলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গিয়ে পড়বে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে। গণতন্ত্র তা হলে আর গণরাষ্ট্র হয়ে উঠবেনা। সেইজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মপ্রচেষ্টা এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার, যাতে দেশের লোকের মধ্যে সত্যানুসন্ধিৎসা ও সত্যের প্রচারে প্রভূত আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তাহলে জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চারিত্রশক্তিও উন্নত হবে এবং পরোক্ষভাবে বিদ্যায়তনের প্রভাব গিয়ে পড়বে সমাজের উপর। এই ব্রতে যদি আমরা সফলকাম হই তাহলে এ দেশে আমরা এমন একটি নূতন ধরনের গণতন্ত্র গঠন করতে পারব—যা গৌরবে গরীয়ান অথচ বিনয়ে নম্র, যা ধৈর্য ও অধ্যবসায়ে অগ্রসর হতে জানে, যা অতীতের বীরশ্রেষ্ঠদের সম্মান করে, ভবিষ্যতের লোকনেতাদের লোক সেবায় উদ্বুদ্ধ করে, দেশের নরনারীর উৎকর্ষই যার মাথার মুকুট এবং যে দেশের সত্যনিষ্ঠা কবির কবিতার মতোই সুন্দর :

অন্তরীক্ষে গ্রহ তারা যে নিয়মে ধায়,
সে নিয়ম দেখি যেন ক্ষুদ্র ঘটনায়।
সুন্দরের সত্য যাহা সত্যেতে সুন্দর,
পূর্ণ তাহে দেখি যেন সর্ব চরাচর।
স্রষ্টা যিনি যেন তাঁরে দেখি সৃষ্টি মাঝে,
জ্ঞানে প্রেমে আরাধনে মানবসমাজে।

কেউ যেন না বলেন যে আমাদের দেশের পক্ষে শিক্ষার পথে নব জন্ম লাভ করা অতিশয় কঠিন। শৈশবে আমার গুরুদের কাছ থেকে আমি কবির ভাষায় যে বীজমন্ত্র পেয়েছি তাতে আমার বিশ্বাস আজো অবিচল :

মহৎ কাজের চিন্তা কেহ যদি করে
সিদ্ধ কাম না হলেও থাকে ধৈর্য ধরে,

রক্ত যদি ঝরে বাধা বিপদের ঘায়
সত্যসন্ধ তবু পথ ছাড়িয়া না যায়,
অবশেষে দুর্যোগের হয় অবসান
জয়মাল্য জিনি লয় বীরের পরাণ।

আপনাদের সকলকে বলি আমার মতো আপনারাও এই কবিতাকে আপনাদের সংকল্প বচনরূপে স্বীকার করে নিন। সর্বশেষে আসুন, আমরা আমাদের জাতীয় কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় জননী জন্মভূমির মঙ্গলে তাঁর এই প্রার্থনামন্ত্র একযোগে উচ্চারণ করি :

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গনতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে,যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়—
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করেনি শতধা—নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

পরিশিষ্ট—খ

১৯১৪ সালের ১৫ জানুয়ারি তারিখে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে বক্তৃতা

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের এই প্রথম অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণের জন্য আমায় আপনারা আমন্ত্রণ করেছেন—সেজন্য আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। তবে নিছক লৌকিক বিনয় বশত নয়, আমার সত্যই মনে হচ্ছে এই সভাস্থলে এমন অনেক প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আছেন যাঁরা আজীবন একমনা হয়ে বিজ্ঞানের সাধনা করে এসেছেন, তাঁদের একজন যদি সভাপতির আসন গ্রহণ করতেন তা হলে অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত হত। তত্রাচ আমি আপনাদের নিশ্চিতি দিয়ে বলতে পারি যদিচ আমার অন্য অনেক ত্রুটি থাকেও, যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আপনারা এই কংগ্রেস আহ্বান করেছেন, সেই উদ্দেশ্য সফল করে তোলার জন্য আমি কারো চাইতে কম ব্যাকুল নই।

যে এশিয়াটিক সোসাইটি ভবনে আমরা আজ সমবেত, সেই ভবনের যেমন একটি ঐতিহাসিক মর্যাদা আছে, তেমনি আজকের এই বিশেষ দিনটিও প্রাচ্য দেশীয় এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিজ্ঞান ও ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার ইতিহাসের দিক থেকে বিশেষভাবে স্মরণীয়। আজ থেকে ঠিক একশো ত্রিশ বছর আগে ১৭৮৪ সালের আজকের এই ১৫ জানুয়ারী তারিখে, স্যর উইলিয়ম জোন্‌স এই এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রিটেনের যে সকল মহৎ সন্তান এ দেশের লোকেদের মধ্যে জ্ঞানের উন্নতি সাধন করতে গিয়ে জীবন উৎসর্গ করেছেন, তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন অশেষ গুণসম্পন্ন কৃতী পুরুষ। প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে এই সোসাইটি দীর্ঘকাল ধরে সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংগঠনে ও

সংবর্ধনে এ দেশে মুখ্য প্রেরণার উৎসরূপে কাজ করে এসেছেন। সুতরাং এই ভবনে সোসাইটির প্রত্যক্ষ আওতার মধ্যে যে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন আহূত হয়েছে—তা সর্বথা যুক্তিযুক্ত হয়েছে। উপরন্তু, সৌভাগ্যের কথা যে কংগ্রেস চলা কালেই এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যদের দ্বারা স্থাপিত ইণ্ডিয়ান ম্যুজিয়ম-এর শতবর্ষপূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই ম্যুজিয়ম-এর বিজ্ঞানীরা নানা বিভাগে যেসব অমূল্য কাজ করেছেন তার ফলে আজ এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম ব্যাপ্ত হয়েছে সারা বিশ্বে। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে এই সময়টা ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস স্থাপনের পক্ষে অনুকূল। এখন আপনাদের অনুমতি নিয়ে যদি আমি সংক্ষেপে এই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ব্যক্ত করি, তা নিশ্চয় অপ্রাসঙ্গিক হবেনা।

আজ থেকে প্রায় দুই বছর আগে লখনউ ক্যানিং কলেজের প্রফেসর ম্যাকমাহন ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রফেসর সাইমনসন্ একটি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দ্য এড্ভান্স্মেণ্ট অব সায়েন্স নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তাঁরা বলেছিলেন এই এসোসিয়েশন-এর উদ্দেশ্য ও কর্মক্ষেত্র হবে ব্রিটিশ এসোসিয়েশন ফর এড্ভান্স্মেণ্ট অব সায়েন্স-এর অনুরূপ—অর্থাৎ এর লক্ষ্য হবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি করে তাকে নির্দিষ্ট পথে চালনা, দেশের বিভিন্ন স্থানে যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞানে আগ্রহী তাঁদের মধ্যে পরস্পর যোগাযোগের ব্যবস্থা, তাত্ত্বিক ও ফলিত বিজ্ঞানের লক্ষ্য বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং বৈজ্ঞানিক কাজের পথে বাধাবিঘ্ন অপসারণ। এ দেশের শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান যেসব ব্যক্তি বিজ্ঞানের উন্নতিতে আগ্রহী, তাঁদের অনেকের কাছে এই প্রস্তাব পেশ করা হয় এবং মূল উদ্দেশ্যটুকু বহু লোকের সমর্থন লাভ করে। বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত যাঁরা ছিলেন তাঁরা অচিরেই বুঝতে পারলেন যদি বিজ্ঞানীদের কাজ সমন্বিত করা যায় ও

তাঁদের মধ্যে সহযোগ স্থাপন করা যায়—সেরকম ব্যবস্থা সর্বথা বাঞ্ছনীয় হবে। আমাদের এই বিরাট দেশে কে কোথায় বিজ্ঞানের কোন শাখা-প্রশাখায় কাজ করে চলেছেন তার একটা দীর্ঘ ও আনুপূর্বিক তালিকা উপস্থিত করার ক্ষেত্র এটা নয়। কী বিরাট ও বিচিত্র কাজে তাঁরা নিযুক্ত আছেন, সেটুকু বুঝতে হলে একবার শুধু স্মরণ করলেই হয় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে যুক্ত এমন কত সংখ্যায় কলেজ আছে যেখানে তাত্ত্বিক ও ফলিত গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা উৎসাহের সঙ্গে পঠনপাঠন হয়। চিকিৎসা বিদ্যা ও যন্ত্রবিজ্ঞান উভয়েরই শিকড় বিজ্ঞানের গভীরে, যদিচ পেশাগতভাবে এগুলিতে শিক্ষার ব্যবস্থা করে বিশ্ববিদ্যালয়েরই অন্তর্গত কোনো প্রতিষ্ঠান, সরকারী বে সরকারী অর্থ সাহায্যে আরো বহু প্রতিষ্ঠান তাত্ত্বিক কিংবা ফলিত বিজ্ঞানের কোনো না কোনো শাখা নিয়ে নিয়মিত কাজ করে চলেছে। তার মধ্যে অন্তর্গত আছে মান মন্দির যেখানে জ্যোতির্মণ্ডল ও গগনমণ্ডল পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আবহাওয়ার খবরাখবর রাখা হয়, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের অন্তর্গত কিছু কিছু বিভাগ আছে যাদের কাজ মূলতঃ বিজ্ঞানভিত্তিক—যথা ভূবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, বনজবিদ্যা, স্বাস্থ্যবিদ্যা, রোগজীবাণুতত্ত্ব, ত্রিকোণমিতিক নিরীক্ষা, সামুদ্রিক সমীক্ষা, প্রত্নবিদ্যা—আর আমাদের চমৎকার প্রদর্শশালাগুলি অতীতে যা প্রাণীতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের সমীক্ষা-কেন্দ্ররূপে কাজ করত। যেখানে কাজের ক্ষেত্র বিশাল ও কাজ বহুবিচিত্র, যেখানে কেউ কেউ একা হাতে কিংবা ছোট ছোট দলে যুক্ত হয়ে, দেশময় ছড়িয়ে কাজ করে চলেছেন, সে ক্ষেত্রে কাজের উন্নতি ও সাফল্যের জন্যই বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যে একটা সাহচর্যের সম্পর্ক গঠন করা অবশ্যই দরকার। বিজ্ঞানকর্মীরা যেন অভিযান-কারী সৈন্যদের মতো দেশের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছেন, এই সৈন্যবাহিনীকে সংহত ও শক্তিমান করে তুলতে হলে সৈন্যদের সুদীর্ঘ কালের জন্য দূরে দূরে স্বতন্ত্রভাবে রাখা যুক্তিযুক্ত হয়না। যাঁরা একই বিষয় কিংবা সম্পর্কিত

বিষয় নিয়ে চর্চা গবেষণা করে থাকেন, পরস্পর যোগাযোগের ফলে তাঁদের দিক থেকে এবং অধীত বস্তুর দিক থেকেও, কত রকম উপকার হতে পারে—সে বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য। বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই ব্যক্তিগত যোগাযোগ কেবল যে পরস্পর লেনদেনের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে এমন নয়। মাঝে মাঝে এই ধরনের দেখাসাক্ষাত ও আলোচনার সুযোগ হলে, তাঁরা তাঁদের বক্তব্য ও মতামত জনসমাজের নিকট উপস্থিত করতে পারেন, এবং প্রয়োজন হলে সরকার বাহাদুরেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। এই শেষোক্ত প্রকারের কাজ যে সুদূর সম্ভাবিত কাজ এমনও নয়—প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় অনেক উন্নত কিংবা প্রগতিশীল সরকারকেও মাঝে মাঝে খোঁচা দিয়ে মনে করিয়ে দিতে হয় যে জনসমাজের স্বার্থে সরকারী তহবিলের উপর বিজ্ঞানের দাবী অগ্রগণ্য হওয়া দরকার। এইভাবে মেলামেশা ও সহযোগের ফলে বিজ্ঞানব্রতীরা নিজ নিজ গবেষণাকে সাফল্য ও লাভের পথে চালনা করতে পারেন, দেশের ও দশের কোন কোন প্রয়োজন বিজ্ঞান মেটাতে পারে সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল হতে পারেন, য়ুরোপীয় ও ভারতীয় বিজ্ঞান কর্মীরা এদেশে বিজ্ঞানের প্রসারে সকর্মকভাবে সহব্রতী হতে পারেন। সেই সঙ্গেই তাঁরা শিল্পপতি শ্রেষ্ঠীদের বলতে পারেন শিল্পের উন্নতি ও নবজাগরণ ঘটাতে গেলে বিজ্ঞানের শরণ নেওয়া ছাড়া উপায় নেই, ভূমধ্যকারী সমাজকে তেমনি বলতে পারেন কৃষির সমস্যা যদি দূর করতে হয় এবং চাষবাসের পদ্ধতিতে বৈপ্লবিক কোনো পরিবর্তন যদি ঘটাতে হয়, তা হলে বিজ্ঞানই হতে পারে তাঁদের প্রধান সহায়। এইসব নানারকম সুবিধা অসুবিধার কথা বিবেচনা করেই একটি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দ্য এড্‌ভান্সমেন্ট অব সায়েন্স প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গেই সকলেরই সমর্থন লাভ করে। কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অনেকে বলবেন যেহেতু বেশির ভাগ বিজ্ঞান কর্মীর কাজের চাপ অত্যধিক, দেশের জলবায়ু আবহাওয়াও সর্বত্র একই ধরনের নয়, এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়

যেতে হলে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে যেতে হয়—সেই কারণে এইরকম সংস্থাকে ভ্রাম্যমাণ করা হলে, এবং বিভিন্ন বৎসরে বিভিন্ন বিজ্ঞান কেন্দ্রে সংস্থার অধিবেশন বসলে—অনেকেরই অসুবিধা ঘটতে পারে। পরিস্থিতিটুকু ভালোভাবে বিবেচনা করার পর, শেষ পর্যন্ত অধিকাংশের মতানুসারে স্থির হয় যে প্রথম বছরে কলকাতায় একটি সায়েন্স কংগ্রেস আহ্বান করা হবে এবং আহ্বান করবেন এশিয়াটিক সোসাইটি। এটাও স্থির হয় ইণ্ডিয়ান ম্যুজিয়ম-এর শতবর্ষপূর্তির উৎসব যে সময় হবার কথা, সেই সময়েই কংগ্রেস বসবে, তার একটা সুবিধা এই হবে যে ভারত সরকার এই উৎসবে যে সব প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আমন্ত্রণ করবেন, তাঁরা সরকারী খরচে কলকাতায় থেকে কংগ্রেস-এর অধিবেশনেও যোগ দিতে পারবেন। আমাদের এই নূতন প্রচেষ্টার পৃষ্ঠপোষকরূপে মহামান্য লর্ড কারমাইকেলকে পেয়ে আমরা কৃতার্থ। রাষ্ট্রশাসক রূপে তাঁর ন্যায়নিষ্ঠা বহুজনবিদিত, বৈজ্ঞানিক গবেষণারও তিনি একজন অকৃত্রিম ভক্ত। যাঁরা এই উদ্‌যোগে অগ্রণী ও সহায়ক—তাঁরা যেমনটি আশা করেছিলেন, অনেকটা তেমন ভাবেই আজকেরও শুভসূচনা করা গেল। ভারত সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, কর্মকর্তাদের ডাকে সাড়া যে দিয়েছেন তার প্রমাণ আমি চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। তাঁদের মধ্যে অনেকেই রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যার কোনো কোনো দিক নিয়ে লেখা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পেশ করে আমাদের প্রতি আনুকূল্য করেছেন। জাতি-বিজ্ঞানের মতো মনোজ্ঞ বিষয় নিয়ে লেখা একটি চমৎকার প্রবন্ধ পাওয়া গেছে। আপনারা তো জানেন অনেকে ভুল করে মনে করেন জাতি-বিজ্ঞান বিজ্ঞান নয়; আশা করা যায় যে এই প্রবন্ধ সেই ভুল ভাঙবে।

এখন আপনাদের প্রত্যেককে, অতিথিসজ্জন ও সদস্য নির্বিশেষে, সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে আমি এই কংগ্রেস অধিবেশনের উদ্‌বোধন করছি।

———

প্রকাশন বিভাগ
তথ্য ও বেতার মন্ত্রক
ভারত সরকার